Vol. 44 | No. 2 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আল-কুরআনের শৈল্পিক বিন্যাস ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষ : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

Volume	44
Issue	2
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, মোহাঃ নজরুল ইসলাম খান
Published online	February 1, 2001
DOI	10.62328/sp.v44i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i2.4
Pages	৬৭-৭৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

প্রমিত বাংলা উচ্চারণ চর্চার ধারা

শ্যামলী আকবর ও সাইফুর রহমান*

হাজার বছরের পুরাতন বাংলা ভাষা বর্তমানে পৃথিবীর পঞ্চম ভাষা। যদিও বাংলা ভাষাভাষী বা বাঙালির মোট সংখ্যার সঠিক হিসেব দেয়া সম্ভব নয়, তবুও বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা রাজ্য, করিমগঞ্জ, কাছাড়, বিহার-উড়িষ্যার পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী জেলা, ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় স্থায়ী বসবাসরত বাঙালির সংখ্যা ২৫ কোটির কম হবে না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এ ভাষার মাধ্যমে এদেশের মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। এ ভাষাকে কখনো বলা হয়েছে 'দেশী ভাষা', কখনো 'প্রাকৃত', কখনো 'গৌড়ীয় ভাষা', কখনো বা 'বাঙ্গালা ভাষা'। পূর্বে বাঙালি বা বাংলা ভাষাভাষিগণ তাদের ভাষা নিয়ে চিন্তাভবনা করত কি না, ইতিহাসে তার স্বাক্ষর কমই আছে, বিশেষ করে উচ্চারণের ক্ষেত্রটি প্রায় শূন্য। মধ্যযুগের বাংলায়ও উচ্চারণের সমতা ছিল না। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় উচ্চারণের ভিন্নতা ছিল এবং সে সম্পর্কে অনেক কৌতুক কাহিনীও রচিত হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ চর্যাপদে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বানান দেখলেই তা লক্ষ্য করা যায়। তাই বাংলা ভাষাভাষীর উচ্চারণ-সংক্রান্ত সম্যক পরিচয়ে আধুনিক যুগকেই অবলম্বন করতে হয়। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষার বাচন প্রক্রিয়া তথা উচ্চারণ নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশিষ্ট ব্যক্তি উনিশ শতকের দিকে নানা তত্ত্ব ও মতবাদ প্রকাশ করেন।

উচ্চারণ

মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো ভাষা, আর এ ভাষা হলো সহজাত, কারণ প্রতিটি মানুষ অন্তত একটি ভাষার সহজাত অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এমন কোন মানবসমাজ

---

* শ্যামলী আকবর – সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সাইফুর রহমান – এম ফিল গবেষক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

পাওয়া যাবে না যেখানে ভাষা নেই। একমাত্র মানুষের ভাষা আছে। অন্য কোন প্রাণীর ভাষা নেই, তাই মানুষ এবং ভাষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ভাষা হচ্ছে মানুষের কাছে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি বা উক্তি। ভাষার মাধ্যম হিসেবে ধ্বনিই শ্রেষ্ঠ। আবার এমনও বলা হয়ে থাকে যে ভাষা হলো অনেকগুলো সংশ্রয়ের একটি সমন্বিত সংশ্রয় – "A combined system of systems। কারণ ভাষার থাকে অর্থ, বাক্য, শব্দরূপ এবং স্বরভাঙ্গী।"[১] ভাষার এই সংশ্রয়গুলোকে ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার স্তর হিসেবে বর্ণনা করেন। বলা হয়ে থাকে ভাষার যতগুলো স্তর আছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ধ্বনিপদ্ধতি। সাধারণত ধ্বনি উৎপাদন পদ্ধতিকে উচ্চারণ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাই বলা যায় উচ্চারণগুলো ভাষা উৎপাদনে মস্তিষ্কের আদেশে ফুসফুস, স্বরতন্ত্রী, স্বরযন্ত্র, নাসারন্ধ্র, জিহ্বা, ঠোঁট এবং অন্যান্য বাক্‌প্রত্যঙ্গের ব্যবহার। উচ্চারণের যথার্থতা নির্ভর করে বাক্‌প্রত্যঙ্গের যথাযথ ব্যবহারের উপর। ধ্বনিতত্ত্ব বর্ণনায় ধ্বনিবিজ্ঞানীরা ভাষার ধ্বনি-উৎপাদনে বাক্‌প্রত্যঙ্গ ব্যবহারের মোটামুটি একটা ছক বা নক্সার নির্যাস প্রদান করতে চেষ্টা করেন। ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনার শুরুতেই Abstraction and approximation অর্থাৎ নির্যাসন এবং আসন্নমান বা নৈকট্যানুসন্ধানের ব্যাপার রয়ে গেছে। ধ্বনি উৎপাদনের চেয়ে ধ্বনি শ্রবণের দিকে অর্থাৎ ধ্বনির পরিমাণের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ধ্বনির শক্তি-পরিমাণ ও কর্ণপটাহের প্রতিক্রিয়া ও ধারণ ক্ষমতা নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।"[২] দেখা গেল একজন বলছে, 'কাল' আর একজন বলছে 'খাল' এখানে কথাটা একই, কিন্তু ধ্বনি দু'রকম। "ধ্বনিকে ধরার তিনটি সময় আছে – (১) যে কথা বলছে সে যখন জিহ্বাদি সঞ্চালন করে ধ্বনি উচ্চারণ করছে তখন, (২) তাঁর মেহনতের দরুন চার পাশের হাওয়া নানা ছন্দে নানা তীব্রতায় যখন নাদে-নিনাদে বেজে উঠছে সে মুহূর্তে, (৩) কথাটা যখন শ্রোতার কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশছে সেই শুভক্ষণে।"[৩]

ধ্বনিবিজ্ঞানীরা ধ্বনিবিজ্ঞানের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ শাখাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেগুলোর মধ্যে উচ্চারণ বিজ্ঞানের উপর জোর দিয়েছেন বেশি। উচ্চারণ বিজ্ঞানের উপর ভাল দখল শুধু ভাষাবিজ্ঞানীরই নয়, প্রায় প্রতিটি মানুষেরই দখল থাকা

---

১. মনসুর মুসা, *ভাষা-পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫৮

২. ঐ, পৃ. ৫৮

৩. প্রবাল দাশগুপ্ত, 'ভাষা বর্ণনার স্বর', *নিসর্গ* (ভাষাতত্ত্ব সংখ্যা, সংকলন/৩) ১৪০০ সম্পাদক, মনিরুজ্জামান, পৃ. ৪

প্রয়োজন। বিশেষ কোন বিজ্ঞানের সাথে পূর্ব পরিচয় না থাকলেও উচ্চারণ বিজ্ঞান ভাল করে শেখা যায়।

মান বা প্রমিত উচ্চারণ

পৃথিবীর কোন ভাষাই একেবারে নিরবচ্ছিন্ন নয় - অর্থাৎ ভাষার বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য থাকে। যেমন আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, শ্রেণী বৈচিত্র্য ইত্যাদি। তবে যে ভাষাটি তার এ সকল বৈচিত্র্য কাটিয়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য রূপে পরিণত হতে পারে তাকে বলা যেতে পারে মানভাষা। আর সবার গ্রহণযোগ্য উচ্চারণকে বলবো মান/ প্রমিত উচ্চারণ। মানভাষা ও উচ্চারণ সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যেমন "মানভাষা ও মান উচ্চারণ মূলত হয়ে থাকে আঞ্চলিক, সামাজিক বা শ্রেণিক।"[৪]

হুমায়ুন আজাদের মতে "বিশেষ একটি অঞ্চলের উপভাষা নানা কারণে প্রাধান্য লাভ করে হয়ে ওটে মান ভাষা, এবং ওই অঞ্চলের উচ্চারণ মর্যাদা পায় মান-উচ্চারণের। তবে ওই অঞ্চলের সবাই মান ভাষা ও মান-উচ্চারণ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা নেয় না ; নেয় একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণী, যার সদস্যরা সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে প্রভাবশালী। ওই প্রভাবশালী শ্রেণীটির উচ্চারণকে অন্যরা মেনে নেয় সুষ্ঠু ও সুন্দর বলে ; এবং এক সময় তা সর্বাঞ্চলিক মান-উচ্চারণরূপে গৃহীত হয়। মান-উচ্চারণ কোনো রাষ্ট্রীয় বিধানের ফল নয় ; তা সামাজিক বিবেচনা ও ভাষিক সৌন্দর্যবোধেরই ফল। তাই মান-উচ্চারণকে বলা হয় 'গৃহীত উচ্চারণ'।"[৫] ইংরেজিতে একে বলা হয় Received Pronunciation (RP)।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন - মান-উচ্চারণ রাজধানীর উপভাষা ও উচ্চারণকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ রাজধানী তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, যার প্রমাণ পাই 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে (১২৯৮)। তিনি বলেন, "কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্ত সার।"[৬] 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' (১৩১৮) প্রবন্ধে তিনি বলেন, "বর্তমানকালে কলিকাতা ছাড়া বাংলাদেশের অপরাপর বিভাগের উচ্চারণকে প্রাদেশিক

---

৪. হুমায়ুন আজাদ, *সীমাবদ্ধতার সূত্র*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১০৫
৫. ঐ, পৃ. ১০৫
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলা শব্দতত্ত্ব*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৭

বলিয়া গণ্য করাই সংগত।"[৭] রবীন্দ্রনাথের এই মতকে অনেকেই মানতে পারেন নি। যেমন, শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী (১৩০৮) বলেন – "শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি, নবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত স্থানের প্রচলিত ভাষাই বিশুদ্ধ বাঙলা ভাষা। কলিকাতা রাজধানী হইলেও এখানে কোন নির্দিষ্ট ভাষা নাই।"[৮]

প্রমথ চৌধুরী 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা' (১৩১৯) প্রবন্ধে বলেন – "ঢাকাই কথা এবং খাস কলকাত্তাই কথা, অর্থাৎ সুতানুটির গ্রাম্যভাষা, দুয়েরই উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত ; সুতরাং ঢাকাই কিংবা খাস কলকাত্তাই কথা পূর্বেও সাহিত্যে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করতে পারে নি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।"[৯] তিনি অবশ্য মান বাংলা ভাষায় যে উপভাষাটিকে ভিত্তি হিসেবে মনে করছেন, তার নাম দিয়েছেন 'দক্ষিণ দেশী'। দক্ষিণ দেশ হিসেবে তিনি নদিয়া, শান্তিপুর, ভাগীরথীর উভয়কূল এবং বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশকে চিহ্নিত করেন।

পরিণত বয়সে (১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথ বলেন – "বিশেষ কারণে টস্‌কানি প্রদেশের উপভাষা সমস্ত ইটালির একভাষা বলে গণ্য হয়েছে। তেমনি কলকাতা শহরের নিকটবর্তী চারদিকের ভাষা স্বভাবতই বাংলাদেশের সকল দেশী ভাষা বলে গণ্য হয়েছে।"[১০] তিনি আরো বলেন – "যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলা ভাষা বলে গণ্য করবো।"[১১]

'চলতি ভাষার বানান' – এ (১৩৩২) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বলেন – "কলিকাতা ও কলিকাতার কাছাকাছি নবদ্বীপ, ভাটপারা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের শিক্ষিত লোকদের উচ্চারণই আধুনিক বাংলার প্রামাণিক উচ্চারণ।"[১২] প্রমথ চৌধুরী কলিকাতা শহরের ভদ্র সমাজের মুখের ভাষাকেই চলতি বাংলার রীতি হিসেবে মেনে নেন।[১৩] সেখানে দক্ষিণদেশির উপভাষা কলকাতা শহরে এসে শিক্ষিত সমাজের উচ্চারণ হিসেবে ভাষিক যোগাযোগরূপে মান চলতি রূপ নেয়। চলতি বাংলার উচ্চারণ আঞ্চলিক

৭. ঐ, পৃ. ৮৯
৮. হুমায়ুন আজাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫
৯.ঐ, পৃ. ১০৫
১০. ঐ, পৃ. ১০৬
১১. ঐ, পৃ. ১০৬
১২. ঐ, পৃ. ১০৬
১৩. ঐ, পৃ. ১০৬

হলেও ক্রমে তা সামাজিক শ্রেণীর উচ্চারণে পরিণত হয় ; এবং "গৃহীত হয় মান বাঙলা ভাষার মান উচ্চারণরূপে,"[১৪] যা এখন সর্বাঞ্চলিক।

প্রমিত উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা

ভাষা সংস্কার, ভাষা-পরিচর্যার প্রসঙ্গে প্রায়ই উচ্চারণ প্রসঙ্গ বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। উচ্চারণ যখন এ-রকম করি তখন লিখি কেন ও-রকম[১৫] অথবা কার উচ্চারণ সঠিক, আমারটি না অন্যেরটি। এ ধরনের বিতর্ক প্রায়ই দেখা যায়, ফলে উচ্চারণের আদর্শ-কামনা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সমাজভাষাতাত্ত্বিক বাস্তবতার আলোকে বলা যায় – বাংলা উচ্চারণে সমতা, ঐক্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঐক্যবোধও নেই। তবে এ কথা সত্যি যে প্রায় প্রত্যেক বাংলাভাষী উচ্চারণে 'আদর্শ কামনা' করেন। উচ্চারণে আদর্শ কামনা "শুধু বাঙলা ও বাঙালীদের মধ্যে নয়, ইংরেজদের, কিংবা আরবদের মধ্যেও এ প্রবণতা আছে..... সম্ভবত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও আছে। এ-উচ্চারণ সম্পর্কিত 'আদর্শ-কামনা' একটি বিশ্বজনীন সমাজভাষাতাত্ত্বিক প্রবণতা।"[১৬]

প্রায় দু'শ বছরেরও অধিক সময় ধরে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অভিধান রচনা হচ্ছে, কিন্তু বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে বিধিবদ্ধ নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেছেন খুব কমজনই। চলতি বাংলায় উচ্চারণ প্রায়ই উচ্চারণকারীকে সমস্যায় ফেলে, তাই চলতি বাংলার উচ্চারণে যদি একটা সমতা বিধান করা যায় তবে বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা হতে কোন অংশেই দুর্বল হবে না।

চর্যাপদে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বানান দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে প্রাচীন বাংলায় উচ্চারণের সমতা ছিল না। তেমনি মধ্যযুগের বাংলাতেও এমনি সমস্যা দেখা যায়।[১৭] তবে মধ্যযুগে ভাষা পরিচর্যা ও ভাষানুশীলন নদীয়ায় ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল যার উদাহরণ আমরা বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাই। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত। এসব আঞ্চলিক ভাষার ধরন-ধারন উচ্চারণ ঐ অঞ্চলের ভাষাভাষীর স্বরূপতার সঙ্গে মিশে আছে। তাই মান ভাষার

---

১৪. ঐ, পৃ. ১০৬
১৫. মনসুর মুসা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪
১৬. ঐ, পৃ. ৫৫
১৭. ঐ, পৃ. ৫৪

উচ্চারণে আদর্শ–কামনা প্রতিফলিত হচ্ছে। অনেকেই মনে করেন - আদর্শ এক ধরনের বৈদগ্ধ্যের পরিচয়, যা অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। যেমন, "বেদের বিশুদ্ধতা রক্ষার তাগিদে এবং কোরানের পবিত্রতা রক্ষার তাগিদে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এবং হাফেজদের মধ্যে এ বৈদগ্ধ্য অর্জনের প্রয়াস প্রবলভাবে উপস্থিত।"[১৮]

পৃথিবীর অনেক জনপদে পারিবারিক পরিবেশে আঞ্চলিক ভাষা এবং অফিস–আদালত, শিক্ষা–প্রতিষ্ঠান তথা লৌকিক পরিবেশে মান ভাষা ব্যবহৃত হয়। বাংলা মান ভাষা ঠিক কোন অঞ্চলের ভাষা নয়, পশ্চিমবঙ্গের ক'টি উপভাষা ভিত্তি করে গড়ে উঠা একটি কৃত্রিম ভাষা। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি এ কৃত্রিম ভাষাটি বুঝেন। সবাই এ ভাষায় পড়ে ও লেখে। কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অফিস, আদালত, শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানে নিজের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন না। যেহেতু আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন না, তাই মান ভাষা তথা মান উচ্চারণের প্রয়োজন রয়েছে।

মান উচ্চারণে সমস্যা

মান উচ্চারণের প্রধান সমস্যা হচ্ছে সামাজিক এবং শ্রেণিক।[১৯] মান উচ্চারণ মূলত শিক্ষিত শ্রেণীর উচ্চারণ, কিন্তু এদেশের বেশির ভাগ লোকই অশিক্ষিত। যার ফলে বাংলা উচ্চারণের সমস্যা এত প্রকট। তাছাড়া ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হতে দেখা যায় বাংলার রাজধানী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় ছিল। "লণ্ডন কিংবা প্যারিসের মত দীর্ঘস্থায়ী রাজধানী বাঙলায় কখনোই গড়ে উঠেনি।"[২০] উচ্চারণের সমতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত রাজধানীর বিদগ্ধজনেরা এক ধরনের ভূমিকা পালন করেন। রাজধানী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরের ফলে বাংলা উচ্চারণ আদর্শ স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করেনি। যদিও বা এক ধরনের ঐক্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। বাংলা উচ্চারণ তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে মাত্র দুটি। মুহম্মদ আবদুল হাই করেছেন 'নাসিক্যধ্বনি' আর কষ্টিক ও দাস (১৯৭২) করেছেন সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের ওপর। তাই বাংলা ভাষার প্রচলিত ধ্বনি সম্পদের যথেষ্ট পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়নি। যেমন বাংলা মূল স্বরধ্বনি নিয়েই যথেষ্ট বিতর্ক আছে। কেউ বলেছেন ৭টি, কেউ বলেছেন ৮টি।

---

১৮. ঐ, পৃ. ৫৫
১৯. হুমায়ুন আজাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৭
২০. মনসুর মুসা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯

তাই ৭/৮টি যদি মূল স্বরধ্বনি হয়, তবে সেই হিসেবে অনুনাসিক হবে ৭/৮টি। একই ভাবে দ্বিস্বরধ্বনির জোড়া সৃষ্টি হবে। এ সম্পর্কে কথক ও প্রশিক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে মান উচ্চারণে সমস্যা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

আমরা সবাই বাংলা বলি, লিখি, কিন্তু মান উচ্চারণেই আমাদের সমস্যাটা। কেন সমস্যা হয় সে সম্পর্কে রাজীব হুমায়ুন 'স্টাণ্ডার্ড কথ্য বাঙলা' নামক একটি প্রবন্ধে কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত করেন। যেমন –

১। আমরা যারা শিক্ষিত তারা অনেক সময় মান উচ্চারণে কথা বলতে চেষ্টা করি না।

২। এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলের লোকের সঙ্গেও নিজের উপ-ভাষায় বাক্যালাপ করতে চেষ্টা করেন।

৩। যাঁরা স্টাণ্ডার্ড কথ্য বাঙলা বলেন বা বলার চেষ্টা করেন তাঁদের অনেকে সম্ভবত নিজেদের অজান্তেই নিজ নিজ উপ-ভাষার উচ্চারণ রীতি ও টান অনুসারেই বলে থাকেন।

৪। কোন কোন অঞ্চলের (যেমন – উত্তরবঙ্গের) লোকের ধারণা তাদের বাংলাই স্টাণ্ডার্ড কথ্য বাঙলা।[২১]

মান উচ্চারণের দরকার হলো উচ্চারণ অসুবিধা এড়ানো, আর এ অসুবিধা হলো পারস্পরিক বোধগম্যতা। আজকে যদি কোন এক শিক্ষিত ব্যক্তি খেয়াল-খুশি মতো নিজের আঞ্চলিক ভাষা অফিসে বলতে শুরু করেন তবে নিশ্চয় একটা সমস্যা দেখা দিবে। ফলে এ সমস্যা এড়ানোর জন্যই মান উচ্চারণের আদর্শ দরকার।

বাংলা উচ্চারণের ইতিহাস

উচ্চারণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় – রবীন্দ্রনাথ অগ্রপথিক। আজ থেকে প্রায় একশত বছরেরও আগে তিনি বাংলা উচ্চারণ নিয়ে চিন্তা করেছেন। এক বিদেশিকে বাংলা শিখাতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন বাংলা উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা। তাই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ বর্ণনামূলক ব্যাকরণবিদ রবীন্দ্রনাথ প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন মান-উচ্চারণ বিধিবদ্ধ করার, শব্দে বিভিন্ন স্বরধ্বনির উচ্চারণের আনুশাসনিক সূত্র

---

২১. রাজীব হুমায়ুন 'স্ট্যাণ্ডার্ড কথ্য বাঙলা' (পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল জানা সম্ভব হয়নি, তবে প্রমাণ পত্র আছে)।

রচনার। তিনি 'বাঙলা উচ্চারণ' (১২৯৮) প্রবন্ধে শব্দ শুরুর 'অ' – বর্ণের উচ্চারণের কিছু সূত্র বিধিবদ্ধ করেন। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' (১৯৩৮) গ্রন্থে তিনি আরো কিছু উচ্চারণ নির্দেশ করেন। এসব প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলে দেয়। পূর্বে মানুষের ধারণা ছিল বাংলা উচ্চারণে কোন সমস্যা নেই। রবীন্দ্রনাথ ধ্বনিতত্ত্বের নিরিখে বাংলা উচ্চারণ বিশৃংখলা দূর করেন।

রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা উচ্চারণ নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করেছেন বিদেশি চিন্তাবিদ। বাংলা বর্ণের জটিলতা নিয়ে প্রথম চিন্তা করেন নাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থে (১৭৭৮)। অন্যদিকে বাংলা উচ্চারণ নিয়ে প্রথম বাঙালি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের মাধ্যমে (১৮৭৯)। এ প্রবন্ধের মূল বিষয় 'লিখিবার ভাষা'। তিনি বলেন – "বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষার যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছু কাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা, অপরটির নাম অপরভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা।"[২২] বঙ্কিম অপর ভাষার ধরনটি কী রকমের তা আঁচ করিয়ে দেন। সংস্কৃতপ্রিয় এবং সংস্কৃতানুসারী বাংলা ভাষার মূলে প্রথম আঘাত দেন টেকচাঁদ ঠাকুর।[২৩] বঙ্কিমের আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৪) গ্রন্থেও বাংলা উচ্চারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষার বর্ণ বা ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণনা অনেকেই করেছেন ; তবে তাঁরা ভাষা উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে পেরেছেন খুবই অল্প, প্রথমে হ্যালহেড উচ্চারণ নির্দেশ করেন ইউরোপীয় প্রথাগত ব্যাকরণের রীতিতে।[২৪] উনিশ শতকের যে কোন ব্যাকরণ গ্রন্থেই নিয়মনীতি বিধিবদ্ধ হয়েছে সংস্কৃতানুসারে। তবে বিশ শতকের কিছুটা বাংলা ধ্বনি সংস্কৃতের হাত হতে রক্ষা পায়। "ফলে বাঙলা ভাষার উচ্চারণ বা তার প্রকরণ বিধৃতির পরিবর্তে সেগুলো হয়ে ওঠে সংস্কৃত হতে ঋণ করে আনা ধ্বনি–ঘটিত বিবৃতির অনুসরণ–অনুকরণ। এতে করে বাংলা ধ্বনি–বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি।"[২৫]

---

২২ মহাম্মদ দানীউল হক, 'বাঙালীর বাঙলা উচ্চারণ সংক্রান্ত চিন্তা : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা', মনসুর মুসা সম্পাদিত 'বাঙালীর বাঙলা ভাষা চিন্তা', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* জুলাই, ১৯৯৪, ঢাকা, পৃ. ১০৮, ১০৯

২৩. ঐ, পৃ. ১০৯

২৪. ঐ, পৃ. ১০৯

২৫. ঐ, পৃ. ১১০

বাংলা উচ্চারণের সার্থক প্রয়াস দেখা যায় বিংশ শতকের শুরুতে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে। এ পত্রিকায় প্রথম বাংলা উচ্চারণের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় শ্রীনাথ সেনের 'সন্ধি' (১৩১৪) রচনায়। 'সংস্কৃত ও বাঙ্গলার প্রভেদ' আলোচনায় তিনি উল্লেখ করেন – "পৃথিবীর সকল ভাষাতেই কথায় সন্ধি হয়, কিন্তু শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষায় কেন লেখাতে সন্ধি হয়।"[২৬] তাঁর মতে – "সংস্কৃত কেবল পদ্য–সঙ্গীতের ভাষা, তাই সেই ব্যাকরণের সম্ভাব্য স্থলে সন্ধির বিধান রাখা আছে উচ্চারণের বিশুদ্ধতা রক্ষাহেতু।"[২৭] তিনি লিখেন – "যেহেতু আমাদের মূল সাহিত্য সংস্কৃত এবং কথিত ভাষা বাংলা সেহেতু স্থল বিশেষে তাহাতে সন্ধির নিয়ম সেই প্রকারই ব্যবহৃত হইবে,... সন্ধি না করিয়া... লিখিলে ভাষা নিতান্ত নিস্তেজ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িবে।"[২৮]

শ্রীনাথ সেনের 'সংস্কৃত ও বাঙ্গলার প্রভেদ' প্রসঙ্গে মহাম্মদ দানীউল হক 'বাঙালীর বাঙলা উচ্চারণ সংক্রান্ত চিন্তা' প্রবন্ধে বলেন – "মনে হয় তিনি বাঙলা ভাষায় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী এবং উচ্চারণ প্রবণতাকে তাঁর নিজস্ব বৈভবে যাচাই করেন নি। বরং, কথ্য–বাংলার ধ্বনি–সংবেদী সৌকর্যকে বিচার করে বিভ্রান্ত হন..... সংস্কৃতানুসরণের পুচ্ছগ্রাহিতায়।"[২৯]

শ্রীনাথ সেনের পরে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'ব্যাকরণে সন্ধি' (১৩১৮) প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বলেন – "ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ মিলিত হইলে যুক্ত উচ্চারণকেই স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য দিতে হইবে। দুইটি আওয়াজ মিশিলে একটি মিশ্র আওয়াজ হইবেই ; সাধারণত শেষের আওয়াজটি প্রথমটিকে ঢাকিয়া ফেলে অথবা একটু হ্রস্ব বা মন্দীভূত করিয়া দেয়া।"[৩০]

প্রকাশচন্দ্র মজুমদার 'বঙ্গভাষায় বর্ণযোজনা ও উচ্চারণ' (১৩১৮) প্রবন্ধের মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালায় লিখিত ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে যে প্রকৃত পার্থক্য বিদ্যমান তা নির্দেশ করেন। তিনি আরো বলেন – "যে সকল বর্ণের উচ্চারণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত থেকে

---

২৬. ঐ, পৃ. ১১১
২৭. ঐ, পৃ. ১১১
২৮. ঐ, পৃ. ১১১
২৯. ঐ, পৃ. ১১১
৩০. ঐ, পৃ. ১১১

অভিন্ন তার সবই ব্যঞ্জন।"[৩১] তা ছাড়া বিভিন্ন বাংলা শব্দে বিভিন্ন বর্ণের যে সকল প্রাকৃত-প্রভাবিত উচ্চারণ ঘটে সেগুলোর ধ্বনিভিত্তিক বিবৃতি-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন তিনি।

'অ' শিরোনাম প্রবন্ধে (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৯৯) দুর্গানারায়ণ সেন বাংলা বর্ণমালা সংস্কার প্রসঙ্গে বাংলা উচ্চারণের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক অ-কারের উচ্চারণ-বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি প্রাচীন মতানুসারে ধ্বনি বর্ণনা করেছেন, যেখানে 'অ'-এর উচ্চারণ দেখিয়েছেন ১৮ প্রকার। তিনি তিন প্রকারে তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেমন হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত 'অ'। তাঁর বেশির ভাগ আলোচনা সংস্কৃতানুসারী, ফলে তিনি বলেন - "পাণিনীয় শিক্ষা আলোচনা করিলে, বুঝা যায় যে, প্রযত্নের ভেদেও হ্রস্ব অ-কার ও দীর্ঘ অ-কারে সাবর্ণের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।"[৩২] তিনি বলেন, "বঙ্গদেশের অ-কারের উচ্চারণ ভ্রষ্ট নহে।"[৩৩] তিনি বাংলা হ্রস্ব 'অ'-বর্ণকে কণ্ঠৌষ্ঠ্য বলে মত দেন। তিনি এও সিদ্ধান্ত দেন যে, "ভারতের অন্যান্য প্রান্তের উচ্চারণ অপেক্ষা বাঙ্গালার অ-কার উচ্চারণ বিশুদ্ধ।"[৩৪] সবশেষে তিনি বলেন - "যে সব স্থানে অ-এর হ, ও উচ্চারণ বৈকল্য বা ধ্বনি বিপর্যাস আছে সে সকল স্থানে শিক্ষা দ্বারা উচ্চারণ সংযত করা ব্যতীত আর উপায় নাই।"[৩৫] ঠিক একই সময়ে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় উচ্চারণ সংক্রান্ত আরো একটি উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশ করেন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, যার শিরোনাম ছিল 'চ বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ'। তিনি তুলনামূলক কালানুক্রমিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন উদাহরণ এবং সংস্কৃত প্রভাবিত ভাষার উদাহরণ এনে দেখান যে, [চ-Ce] এবং [জ-Ze] দন্ততালব্য উচ্চারণ প্রকৃতপক্ষে 'চ'-বর্গীয় ধ্বনির ব্যত্যয় বিশেষ। গ্রিয়ার্সন ও বিমসের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দাঁড় করাতে চেয়েছেন, বাংলাসহ ভারতের আধুনিক ভাষাসমূহে যে [চ-Ce] এবং [জ-Ze] উচ্চারণ, তা মূলত ফরাসি ভাষা হতে সংক্রমিত।[৩৬]

---

৩১. ঐ, পৃ. ১১২
৩২. ঐ, পৃ. ১১৩
৩৩. ঐ, পৃ. ১১৩
৩৪. ঐ, পৃ. ১১৩
৩৫. ঐ, পৃ. ১১৩
৩৬. ঐ, পৃ. ১১৩

পরোক্ষভাবে বাংলা উচ্চারণ-সংক্রান্ত চিন্তার প্রকাশ ঘটে ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রমথ চৌধুরীর 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা' প্রবন্ধের মাধ্যমে। তিনি ভাষায় প্রাদেশিকতা এবং উচ্চারণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন – "লেখার ভাষা শুধু মুখের ভাষার প্রতিধ্বনি মাত্র।"[৩৭]

এ পর্যন্ত যতজন বাংলা উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সুশৃঙ্খল আলোচক। তাঁর আগে সবাই বিক্ষিপ্ত বা প্রথাগত রীতিতে বাংলা উচ্চারণ নিয়ে চিন্তা করেছেন। সুনীতিকুমারের পদ্ধতি ছিল কালানুক্রমিক। তাঁর ১৯২১ সালে রচিত 'বেঙ্গলী ফনেটিক্স' নিবন্ধটি পরে 'A brief Sketch of Bengali Phonetics' নামে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি বাংলা ধ্বনির শৃঙ্খলা উদ্ঘাটন করতে গিয়ে ব্রিটিশ ধ্বনিবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোন্সের পদ্ধতি অনুসরণ করেন। সুনীতিকুমারকে বাংলা উচ্চারণের প্রথম যথার্থ দিশারি বলা হয়ে থাকে তাঁর কালজয়ী বিশাল গ্রন্থ ODBL-এর জন্য। এতে তিনি বাংলা ভাষার ধ্বনিবিন্যাসের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। ODBL-এর চতুর্থ পরিচ্ছেদ অংশটুকু সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা 'স্বর-সংগতি', 'অপিনিহিতি', 'অভিশ্রুতি', 'অপশ্রুতি' শিরোনামে (১৩৩৬/১৯২৯) প্রকাশ করে। এ পরিভাষাগুলো নির্মাণ করেন সুকুমার সেন। তিনি এ চারটি রীতি বিশ্লেষণ করে উচ্চারণ বিভ্রাটের রহস্যভেদ করেন।

'চলতি ও সাধুভাষা' রচনাটির জন্য রবীন্দ্রনাথকে আবারো শ্রদ্ধা জানাতে হয় এ জন্যে যে, তিনি এ গ্রন্থে বাংলা ধ্বনির শৃঙ্খলা তথা উচ্চারণ নিয়ে গভীরভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। 'বাংলা ভাষার পরিচয়' (১৯৩৮) গ্রন্থে তিনি সাধু-চলতি ভাষার পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ক্রিয়াপদের উচ্চারণের যে পার্থক্য হয় তা উল্লেখ করেন, যা দুর্গানারায়ণ সেনের 'অ', সুনীতিকুমারের 'স্বর-সংগতি', 'অপিনিহিতি', 'অভিশ্রুতি', 'অপশ্রুতি'র সাথে তুলনা করা যায়।

বাংলা উচ্চারণের ইতিহাসে বাঙালি ভাষা-বিজ্ঞানীদের চিন্তা-চেতনায় কিছুটা স্তিমিত ও পরিবর্তনের রূপ দেখা যায় ভারত বিভাগের পর। পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রিক এবং পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। পূর্ববঙ্গে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষাভাষীদেরকে নবতর রাজনৈতিক-ভাষিক চেতনায় উজ্জীবিত করলেও মূলত বর্ণ ও বানান সংস্কার নিয়ে মেতে থাকতে দেখা যায়। এ

৩৭. ঐ, পৃ. ১১৪

কথা ঠিক উচ্চারণের উপর কাজ হয়েছে, তবে তা যথেষ্ট নয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বর্ণ ও বানান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন তাঁর একটি প্রবন্ধে, যার শিরোনাম 'বাংলা ভাষার ধ্বনি ও সংস্কার' (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৭)। বাংলা ভাষার ধ্বনি বিশ্লেষণে নিবেদিতপ্রাণ মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ভাষার ধ্বনিকে বিশ্লেষণ করেছেন আধুনিক ও সুশৃঙ্খলভাবে তাঁর 'ধ্বনি-বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থে। তিনি মান বাংলা উচ্চারণের সাথে বাংলাদেশের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নির্দেশ করেন 'আমাদের বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৫)। মুহাম্মদ দানীউল হক রচিত 'বাঙালীর বাংলা উচ্চারণ সংক্রান্ত চিন্তা' প্রবেন্ধ উল্লেখ করেন – "একই সঙ্গে তিনি উপস্থাপন করেন বর্ণনামূলক ও আনুশাসনিক কৌশল, এইরূপ ভাষাতাত্ত্বিক অবস্থাটা বোঝার জন্য যে, কেমন করে এক অঞ্চলের লোক একই কর্মক্ষেত্রে অন্য অঞ্চলের লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব উপভাষার ওপরে নির্ভর না করলেও তার উপভাষার নিজস্ব ধ্বনি-পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।"[৩৮] দানীউল হক আরো বলেন – "কৃষ্ণনগরে শিক্ষাচর্চাকারী অধ্যাপক হাই যেহেতু ছিলেন বিশুদ্ধ ধ্বনিবাদী তাই উচ্চারণের স্থূলতার পরিবর্তে সূক্ষ্মতাবোধ আনয়নের প্রয়াসই ছিল তাঁর মূল ভাবনা।"[৩৯]

বাংলা ভাষার ধ্বনি বিশ্লেষণে শৃঙ্খলা সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন চার্লস ফার্গুসন ও মুনির চৌধুরী 'Phonemes of Bengali' নামে। এ প্রবন্ধে তাঁরা বাংলা উচ্চারণে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও ধ্বনিমূল ও তার বৈশিষ্ট্য নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। ১৯৭০-এ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রকাশিত মুনীর চৌধুরীর 'বাঙলা গদ্যরীতি' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এক সময় বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার বিষয়ে বেশ কিছু লেখালেখি হয়, বিশেষ করে ধ্বনিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে অনেকে (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ আবদুল হাই, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী) মনে করেন– "আমরা লিখি সংস্কৃত, কিন্তু উচ্চারণ করি বাংলা।"[৪০] মহাম্মদ দানীউল হক বলেন, "১৮৮৫/১৮৯০ খ্রীঃ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত এক্ষেত্রে যে একটা জোয়ার এসেছিল, তারপর কিন্তু ৬০-দশক পর্যন্ত তার স্তিমিতিই লক্ষ্য করা গেছে – বাঙলা ভাষাভাষী

---

৩৮. ঐ, পৃ. ১১৭
৩৯. ঐ, পৃ. ১১৭
৪০. ঐ, পৃ. ১১৮

উভয় রাজনৈতিক অঞ্চলে।"[৪১] বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকে বাংলা উচ্চারণের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাঁদের মধ্যে কিছু আছেন ভাষাতাত্ত্বিক আর কিছু অভাষাতাত্ত্বিক। উচ্চারণ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন কার উচ্চারণ স্ট্যাণ্ডার্ড। তারপরেও উচ্চারণ অভিধান রচিত হয়েছে।

১৯৭৪–এ আ.ন.ম. বজলুর রশীদের 'স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষা' প্রকাশ করে বাংলা একাডেমী। ৮০–র দশকে শিশু একাডেমী পত্রিকায় বাংলা উচ্চারণ সংক্রান্ত তাঁর কিছু লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমী জামিল চৌধুরীর 'বানান ও উচ্চারণ' গ্রন্থটি প্রকাশ করে। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে দানীউল হক বলেন – "এগুলোতে বর্ণনামূলক পদ্ধতিতেই বাঙলা ধ্বনির পরিচয় ও উচ্চারণ রীতির পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে – উৎপাদনী প্রপঞ্চ এবং প্রাকৃতিক ধ্বনি–বিন্যাসের প্রক্রিয়ায় উচ্চারণ সংক্রান্ত আলোচনা হয় নি।"[৪২]

উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত তিনটি উচ্চারণ অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। ধীরানন্দ ঠাকুর রচনা করেন 'বাংলা উচ্চারণ কোষ' (১৯৫৩)। এতে তিনি উচ্চারণের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। গণমাধ্যমে ব্যবহার্য বাংলা উচ্চারণ প্রমিতকরণে সহায়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ১৯৮৮ সালে প্রকাশ করে 'ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান।' এ অভিধানটি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন আনিসুজ্জামান, জামিল চৌধুরী, নরেন বিশ্বাস এবং ওয়াহিদুল হক। ১৯৯০, ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে নরেন বিশ্বাসের 'বাঙলা উচ্চারণ অভিধান'।

অভিধান রচয়িতা প্রায় প্রত্যেকেই উচ্চারণের নিয়ম সম্পর্কে এক মত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু ব্যতিক্রম সম্পর্কে মতপার্থক্য মেটাতে পারেননি। যার ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতভেদ পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৪ সনে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে মহাম্মদ দানীউল হক পাঠ করেন 'বাঙালীর বাঙলা উচ্চারণ সংক্রান্ত চিন্তা' প্রবন্ধটি।

পরে তা অধ্যাপক মনসুর মুসার সম্পাদনায় 'বাঙালীর বাঙলা ভাষা চিন্তা'

---

৪১. ঐ, পৃ. ১২১
৪২. ঐ, পৃ. ১২০

(১৯৯৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। দানীউল হক প্রবন্ধে উচ্চারণের ইতিহাস সম্পর্কে একটা তালিকা প্রদান করেন – যেমন –

বাংলার ধ্বনি – আ.ন.ম. বজলুর রশীদ (ভাষা সাহিত্য পত্র, ১৩৮২)

বাংলার সন্ধি স্বর – আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (ভাষা সাহিত্য পত্র, ১৩৮৪)

আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি ও বাঙলা বর্ণমালা – মহাম্মদ দানীউল হক (ভাষা সাহিত্য পত্র, ১৩৮৭)

বাংলা উচ্চারণ সমস্যা – আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, (ভাষা সাহিত্য পত্র, ১৩৮৭)

শ্রুতিগত ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাঙলা স্বরধ্বনি – মহাম্মদ দানীউল হক, (ভাষা সাহিত্য পত্র, ১৩৯০)

ধ্বনি–বৈশিষ্ট্যের বিচার – মহাম্মদ দানীউল হক, (ভাষা সাহিত্য পত্র, ১৩৯০)

মূল ধ্বনিতত্ত্ব – আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, (সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৮১)

ফোনিমের ধারণা – মহাম্মদ দানীউল হক, (ভাযা সাহিত্য পত্র, ১৩৯৫)

কথ্য বাংলার ব্যবহার ঃ উচ্চারণ প্রসঙ্গ – মহাম্মদ দানীউল হক (ভাষা পত্র, চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৮৬)

প্রসঙ্গ ঃ ধ্বনিগুণ – মহাম্মদ দানীউল হক, (জাহাঙ্গীরনগর রিভিউ, ১৯৮৮)

অভিধান দেখা থেকে পরা – সুবীর রায় চৌধুরী

বাংলাদেশ অভিধান প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য – ঋষি দাস

আধুনিক বাংলা অভিধান ঃ কিছু সংলগ্ন ভাবনা –নিখিল দাশ

বাংলা উচ্চারণ কোষ প্রসঙ্গে – সুভাষ ভট্টাচার্য[৪৩]

দ্বিমাত্রিকতা না দ্বিতীয় স্বরলোপ – পবিত্র সরকার (ভাষা, সুনীতি সংস্করণ, ১৯৮২)

বাংলা বানান সংস্কার ও সম্ভাবনা – পবিত্র সরকার, (কলিকাতা, ১৯৮৭)

বাংলা বলো – পবিত্র সরকার (প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৮৯)

চলিত বাংলা উচ্চারণ ঃ ক্যাসেট বাংলা উচ্চারণ লেখা এবং অনুশীলন – বাংলাদেশ ইন্টিটস্ অব ডিসটেন্ট এডুকেশন (বাইড)।[৪৪]

---

৪৩. ঐ, পৃ. ১২৩
৪৪. ঐ, পৃ. ১২৪

বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে বাংলাভাষীর চিন্তা-চেতনা ইতিহাসের ক্রমধারা পেরিয়ে আজকে যে পর্যায়ে এসেছে তাকে অনেকটা সফল বলা চলে। তার প্রমাণ বাইড প্রকাশিত উচ্চারণ ক্যাসেট, বিভিন্ন আবৃত্তি-সংগঠন, নাট্যদল ও কণ্ঠ-অনুশীলন গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা। অত্যন্ত সীমিত ও অপূর্ণাঙ্গ হলেও রেডিও-টিভির প্রচেষ্টা উচ্চারণে কার্যকর প্রভাব সৃষ্টি করবে বলা যেতে পারে।[৪৫]

বাংলা প্রমিত উচ্চারণ নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতামতগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জানি, এ পর্যন্ত বাংলা উচ্চারণের উপর তিনটি অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। এসব অভিধানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বেশির ভাগই অভাষাতাত্ত্বিক। ১৯৯০ সালে বাংলা একাডেমী হতে প্রকাশিত নরেন বিশ্বাসের 'বাংলা উচ্চারণ অভিধান'-এ বিধিবদ্ধ বিভিন্ন নিয়ম সম্পর্কে অনেকের মতভেদ আছে। হুমায়ুন আজাদ 'সীমাবদ্ধতার সূত্র' (১৯৯৩) গ্রন্থে 'মান বাঙলা উচ্চারণ ও উচ্চারণ অভিধান' প্রবন্ধে মতভেদ তুলে ধরেছেন। আমরা জানি, ভাষা-শিক্ষণ ও চর্চার আধুনিক প্রায়োগিক নিয়মাবলি অনুযায়ী উচ্চারণ অভিধানে IPA (International Phonetic Alphabet)-এর ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু বাংলা উচ্চারণ অভিধানে তা করা হয়নি। কিন্তু আমরা যদি ইংরেজি ভাষার দিকে তাকাই তবে সেখানে দেখব যে, Oxford এবং Cambridge হতে প্রকাশিত ইংরেজি অভিধানে IPA ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে Received Pronunciation (RP)-এর মূল্য অনেক বেড়ে গেছে। বাংলা গণমাধ্যমে নিয়োজিত কর্মীদের ব্যবহারের সুবিধার দিক বিবেচনা করে মোটা দাগে উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে। এতে মনে হয় তা IPA দিয়ে নির্দেশ করলে বুঝতে সুবিধা হতো। অবশ্য তার জন্য IPA চার্ট সংযোজন প্রযোজ্য।

বাংলা প্রমিত উচ্চারণের ক্রমবিকাশের ধারায় ভাষাবিদগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে যেসব মতামত প্রদান করেছেন সেসব মতামত আজকের বাংলা প্রমিত উচ্চারণের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনার কাজ করেছে। এক্ষেত্রে স্বরধ্বনি সংখ্যা, 'অ' ধ্বনি সম্পর্কে মতামত, স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা এবং ব্যঞ্জন ধ্বনির 'ঋ', 'ণ', 'ষ', 'ত', 'ৎ' সম্পর্ক এবং কয়েকটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির উপর বিভিন্ন ভাষাবিদের মতামত উল্লেখ করা হলো :

---

৪৫. ঐ, পৃ. ১২২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'অ'- ধ্বনি

"অ কিংবা অকারান্ত বর্ণ উচ্চারণকালে মাঝে মাঝে ও কিংবা ওকারান্ত হইয়া যায়। যেমন ঃ অতি, কলু, ঘড়ি, মরু, দক্ষ, ইত্যাদি। এরূপ স্থানে অ যে ও হইয়া যায়, তাহাকে হ্রস্ব–ও বলিলেও হয়। দেখা গিয়াছে অ কেবল স্থান বিশেষেই ও হইয়া যায়, সুতরাং ইহার একটা নিয়ম পাওয়া যায়।

১ম নিয়ম। ই (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) অথবা উ (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) কিংবা ইকারান্ত উকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে তাহার পূর্ববর্তী অকারের উচ্চারণ 'ও' হইবে যথা ; অগ্নি, অগ্রিম, কপি, তরু, অঙ্গুলি, অধুনা, হনু ইত্যাদি।

২য়। যফলা–বিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে 'অ' 'ও' হইয়া যাইবে। এ নিয়ম প্রথম নিয়মের অন্তর্গত বলিলেও হয়, কারণ যফলা 'ই' এবং 'অ'–এর যোগমাত্র। উদাহরণ গণ্য, দন্ত্য, লভ্য ইত্যাদি।

৩য়। ক্ষ পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্তী 'অ' 'ও' হইয়া যায় ; যথা, অক্ষর, কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ ইত্যাদি।

৪র্থ। ক্রিয়াপদে স্থলবিশেষে অকারের উচ্চারণ 'ও' হইয়া যায় ; যেমন, ম'লে, ক'রলে, প'ল, ম'ল ইত্যাদি।

৫ম। ঋফলা–বিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্বের অকার 'ও' হয় ; যথা, কর্তৃক, ভর্তৃ, মসৃণ, যকৃৎ ইত্যাদি।

৬ষ্ঠ। এবারে যে–নিয়মের উল্লেখ করিতেছি তাহা নিয়ম কি নিয়মের ব্যতিক্রম বুঝা যায় না। দ্ব্যক্ষর–বিশিষ্ট শব্দে দন্ত্য 'ন' অথবা মূর্ধন্য 'ণ' পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অকার 'ও' হইয়া যায় ; যথা, বন, ধন, জন, মন, মণ। 'ঘন' শব্দের উচ্চারণের স্থিরতা নাই। কেহ বলেন 'ঘনো দুধ' কেহ বলেন "ঘোনো দুধ"। কেবল 'গণ' এবং 'রণ' শব্দ এই নিয়মের মধ্যে পড়ে না। তিন অথবা তাহার বেশী অক্ষরের শব্দে এই নিয়ম খাটে না; যেমন, কনক, গণক, সন্‌সন্‌, কন্‌কন্‌। তিন অক্ষরের অপভ্রংশে যেখানে দুই অক্ষর হইয়াছে সেখানেও এ–নিয়ম খাটে না; যেমন, কহেন শব্দের অপভ্রংশ ক'ন, হয়েন শব্দের অপভ্রংশ হ'ন ইত্যাদি। যাহা হউক ষষ্ঠ নিয়মটা তেমন পাকা নহে।

৭ম। ৪র্থ নিয়মে বলিয়াছি অপভ্রংশে ইকারের লোপ হইলেও পূর্ববর্তী 'অ' 'ও' হইয়াছে। অপভ্রংশে উকারের লোপ হইলেও পূর্ববর্তী অ উচ্চারণস্থলে ও হইবে; যথা, হউন-হ'ন্ রহুন-র'ন, কহুন-ক'ন ইত্যাদি।

৮ম। রফলা-বিশিষ্ট বর্ণের সহিত 'অ' লিপ্ত থাকিলে তাহা 'ও' হইয়া যায় ; যথা, শ্রবণ, ভ্রমণ। কিন্তু 'য়' পরে থাকিলে অ-এর বিকার হয় না; যথা, ক্রয়, ত্রয়, শ্রয়।"[৪৬]

ব্যতিক্রম – "ই, উ, যফলা ঋফলা ক্ষ পরে থাকিলেও অভাবার্থসূচক অ-এর বিকার হয় না; যথা, অকিঞ্চন, অকুতোভয়, অখ্যাতি, অনৃত, অক্ষয়।"[৪৭]

তিনি আরও বলেন, "দেখা যাইতেছে ও-স্বরবর্ণের প্রতি বাংলা উচ্চারণের কিছু বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রথমত, আমরা সংস্কৃত অ-র বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। আমাদের অ, সংস্কৃত অ এবং ও-র মধ্যবর্তী।"[৪৮] তাই 'অ' যে 'ও' হয়, এটাকে রবীন্দ্রনাথ হ্রস্ব-ও বলেছেন।

স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা :

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত – "সংস্কৃত বর্ণমালায় 'অ' এবং 'আ'-এ হ্রস্ব দীর্ঘের প্রভেদ, কিন্তু বাংলা বর্ণমালার তাহা নহে। বাংলা 'অ' আকারের হ্রস্ব নহে, তাহা একটি স্বতন্ত্র স্বর, অতএব সংস্কৃত 'অ' যেখানে খাটে বাংলা 'অ' সেখান খাটে না।"[৪৯]

ঋ, ণ, য়

'ঋ' সম্পর্কে বলেন – "কেবল সঙ সাজিয়া আছে। চেহারা দেখিলে হাসি আসে, কিন্তু মুখস্থ করিবার সময় শিশুদের বিপরীত ভাবোদয় হয়।"[৫০] তিনি ঋ ফলা উচ্চারণে বাংলায় ই-কার যোগ করে উচ্চারণ করার নির্দেশ দেন।

'ণ' – সংস্কৃত প্রভাবিত হয়ে বাংলায় 'ণ' আনা হয়েছে। ফলে প্রশ্ন তোলেন

---

৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮, ১৯
৪৭. ঐ, পৃ. ২০
৪৮. ঐ, পৃ. ২২
৪৯. ঐ, পৃ. ১৬১
৫০. ঐ, পৃ. ১৬

'বানান' লিখতে কোন্ 'ন' লাগবে। 'ণ' ব্যবহারকে অনেকটা ব্যাধির সংক্রামকতার লক্ষণ প্রকাশ বলে মত দেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন – "প্রাকৃত বাংলায় তো মূর্ধন্য ণয়ের সাড়া নেই কোথাও। মুদ্রাযন্ত্রকে দিয়ে সবই ছাপানো যায় কিন্তু রসনাকে দিয়ে তো সবই বলানো যায় না। কিন্তু যে মূর্ধন্য ণয়ের উচ্চারণ প্রাকৃত বাংলায় একেবারেই নেই, গায়ে পড়ে তার আনুগত্য স্বীকার করতে যাবো কেন? এই পাণ্ডিত্যের অভিমানে শিশুপালদের প্রতি যে অত্যাচার করা যায় সেটা মার্জনীয় নয়। প্রাকৃত বাংলায় মূর্ধন্য ণয়ের স্থান কোনোখানেই নেই এমন কথা যে-সাহসে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করতে পেরেছেন সেই সাহস এখনো আরো কতক-দূর তাঁদের ব্যবহার করতে হবে। এখনো শেষ হয়নি কাজ।"[৫১]

শ. ষ. স – "আমরা বলি আমাদের তিনটে স-এর উচ্চারণের কোনো তফাত নাই, বাংলায় সকল স-ই তালব্য শ-এর ন্যায় উচ্চারিত হয় ; কিন্তু আমাদের যুক্ত অক্ষর উচ্চারণে এ কথা খাটে না। তার সাক্ষ্য দেখো কষ্ট শব্দ এবং ব্যস্ত শব্দের দুই শ-এর উচ্চারণের প্রভেদ আছে। প্রথমটি তালব্য 'শ', দ্বিতীয়টি দন্ত্য 'স'। 'আসতে হবে' এবং "আশ্চর্য এই উভয় পদে দন্ত্য স ও তালব্য শ-এর প্রভেদ রাখা হইয়াছে।"[৫২]

খণ্ড 'ৎ'

হসন্ত ত-এর চিহ্ন হিসেবে 'ৎ' ব্যবহার করেছেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

স্বরধ্বনির সংখ্যা

একক স্বরধ্বনি (Monophthongs) হিসেবে বাংলায় ৭টি স্বরধ্বনির কথা উল্লেখ করেন। অ, আ, ই, উ, এ, ও, এ (অ্যা)।[৫৩]

'অ' ধ্বনি

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'অ' কারের দু'টি উচ্চারণ চিহ্নিত করেন।

---

৫১. ঐ, পৃ. ২৭৪
৫২. ঐ, পৃ. ১৭
৫৩. *শহীদুল্লাহ রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, সম্পাদিত বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ. ৪৮৪

ক) শুদ্ধ – অশোক, অলস।

খ) বিকৃত – এটাকে আবার হ্রস্ব ওকারের মতো বলে অভিহিত করেন। এক্ষেত্রে ৪টি সূত্র চিহ্নিত করেন। যেমন –

১) ই, উ, ঋ কারের আগে – অতি, কলু।

২) য-ফলার আগে – পথ্য, সত্য।

৩) ক্ষ-এর আগে – বক্ষ, লক্ষ।

৪) শেষের আকার উচ্চারিত হলে – ভাল, গাঢ়।

এই বিকৃত 'অ' দেখানোর জন্য অ' চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।[৫৪]

স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা

এ সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "... প্রত্যেকটি হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ আছে। ইহা খাঁটি বাঙ্গালার একটি বিশেষত্ব।"[৫৫] তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে, বাংলা ভাষার হ্রস্বতা-দীর্ঘতা কালের (সময়) উপর নির্ভরশীল। তাই তিনি হ্রস্ব হিসেবে – [অ, ই, উ, ঋ], দীর্ঘ হিসেবে – [আ, ঈ, ঊ, এ ও] চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে "বাঙ্গালা ভাষায় সকল সময়ে ইহাদের হ্রস্ব বা অল্পকাল স্থায়ী, কিংবা দীর্ঘ বা দীর্ঘকাল স্থায়ী উচ্চারণ হয় না। বস্তুতঃ বাঙ্গালা ভাষার দীর্ঘ 'অ' এবং হ্রস্ব 'আ', 'এ', 'ও' আছে।"[৫৬]

ঋ, ণ, ষ

'ঋ'– বাংলায় 'রি' উচ্চারিত হয়। তাই তিনি 'ঋ'কে পৃথক বর্ণ বলে মানতে রাজি নন।

'ণ'– বাংলায় যেহেতু 'ণ' শব্দের শুরুতে বসে না, তাই 'ন, ণ'–এর উচ্চারণ একই বলে চিহ্নিত করেন।

শ, ষ, স

এদের উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই বলে মত প্রকাশ করেন। যুক্ত বর্ণ, স্ক, স্থ,

৫৪. ঐ, পৃ. ১৬৬
৫৫. ঐ, পৃ. ৪৮৪
৫৬. ঐ, পৃ. ১৬৪

স্ত ক্ষেত্রে যুক্ত 'স' এর উচ্চারণ শুদ্ধ, ইংরেজি 'S' এর মত বলে উল্লেখ করেন। খাঁটি বাংলা হিসেবে 'ষ' উচ্চারণ নেই, এটার উচ্চারণ 'শ' হিসেবে দেখান। একমাত্র বিদেশি শব্দ 'স' উচ্চারণ নির্দেশ করেন। যেমন- সালাম, মুসলমান। বাংলায় 'ষ' এবং 'স' ব্যবহারকে কৃত ঋণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

খন্ড 'ৎ'

যেহেতু বাংলায় 'ৎ' এর জন্য আলাদা কোন বর্ণ নেই, তাই এটাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বর্ণের মতো হসন্ত দিয়ে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে – "ৎ-এর জন্য পৃথক বর্ণ অপ্রয়োজনীয়। ক্, দ্ প্রভৃতির ন্যায় 'ত্' বেশ চলতে পারে।"[৫৭]

সংযুক্ত ব্যঞ্জন হ্র, হ্ন, হ্ব, হ্ল, হ্ন, হ্ম

যুক্তবর্ণ হিসেবে দেখান "হ-যুক্ত বর্ণের হকার উচ্চারণে পরবর্তী (Sic) হয় এবং তাহার স্থানে পূর্ব বর্ণের মহাপ্রাণ উচ্চারণ হয়। যথা – অপরাহ্ণ (অপরান্হ, হ= nh) ব্রাহ্ম) ব্রাম্হ, হ=mh) আহ্লাদ (আল্হাদ, হ = lh)।"[৫৮]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বরধ্বনির সংখ্যা

বাংলা স্বরধ্বনির সংখ্যা সম্পর্কে বলেন –"বাঙ্গালা বর্ণমালায় স্বর-বর্ণের সংখ্যা তেরটী, কিন্তু সাধু ও চলিত বাঙ্গালার বিভিন্ন ও বিশিষ্ট স্বর-ধ্বনির সংখ্যা মাত্র এই সাতটী ঃ (অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা' ও)।"[৫৯]

অ ধ্বনি

"অ-কারের দুই প্রকার উচ্চারণ বাঙ্গালায় পাওয়া যায় ঃ ১) সাধারণ উচ্চারণ – অনেকটা ইংরেজী law, all caught-এর স্বর-ধ্বনির মতো ; যেমন কথা, চলা, অধীর ইত্যাদি ; ইহাই বাঙ্গালা 'অ'- এর স্বকীয় উচ্চারণ।

---

৫৭. ঐ, পৃ. ৪৮৫
৫৮. ঐ, পৃ. ১৬৮
৫৯. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৩

২) ও–কারের উচ্চারণ – সাধারণত পরবর্তী অক্ষরে ই বা উ ধ্বনি থাকিলে, বা য-ফলা অথবা 'ক্ষ' থাকিলে অ-কার ও-কারবৎ উচ্চারিত হয় ; যেমন – অতি [= ওতি], বসু [= বোশু] ।[৬০]

স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা

স্বরধ্বনির হ্রস্বতা–দীর্ঘতা সম্পর্কে বলেন – "বাঙ্গালা ভাষায় স্বরবর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণের উপরে শব্দের অর্থ নির্ভর করে না। স্বর-ধ্বনির হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা সম্বন্ধে বাঙ্গালা উচ্চারণে কতকগুলো বিশেষ নিয়ম আছে। সমগ্র শব্দটির দৈর্ঘ্যের সহিত, তদন্তর্গত স্বর-ধ্বনির দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা বিজড়িত Monosyllabic অর্থাৎ একাক্ষর পদ, সাধারণতঃ বাঙ্গালায় দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয় ; 'দিন (দিবস), দীন (দরিদ্র), দিন (=দিউন, আপনি দান করুন), দীন (মুসলমান ধর্ম), – এই চারটি একাক্ষর শব্দের উচ্চারণ একপ্রকারের – একক অবস্থিত বা উচ্চারিত হইলে, চারিটিই দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয় ; কিন্তু একাধিক অক্ষরের পদে, অথবা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যে আসিলে, এই শব্দের ই-ধ্বনি দীর্ঘ হইতে হ্রস্ব হইয়া দাঁড়ায়, যথা, দিন – কাল, দীন – দুঃখী ; বইটি আমার দিনতো ; দীন–দুনিয়ার মালিক।"[৬১]

ঋ, ণ, ষ

'ঋ'– বাংলায় 'রি' হিসেবে উচ্চারণ দেখান। যা ব্যঞ্জন বর্ণ 'র'–এ 'ই'– কার যোগে গঠিত ধ্বনিদ্বয়কে স্বরবর্ণ হিসেবে রাখতে রাজি নন। প্রাচীন সংস্কৃতে অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়া 'র' হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে উল্লেখ করেন। বাংলায় 'ঋ' প্রবেশ সম্পর্কে বলেন – "পুরাতন বাঙ্গালায় 'ঋ' এর উচ্চারণ কেবল [রি] ছিল না –[রি ; এর ; রে ; এর ; র ; অর ; রো ; ওর ;] – এতগুলি হইত ; প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে, এই সব উচ্চারণ ধরিয়া 'অমৃত' স্থলে [অম্রিত, অমর্ত, অমের্ত, অম্রেত, অম্রোতো, অমোর্তো] ইত্যাদি শুনা যায়। .... বাঙ্গালা ভাষায়, বর্ণ মালার বাহিরে, স্বর-বর্ণ 'ঋ'–এর অস্তিত্ব নাই ; কেবল বাঙ্গালা ভাষার তৎসম শব্দের বানানে যথাবত 'ঋ' লিখিত হয় ; যেমন , ঋষি, ঋণ।"[৬২] তিনি আরো বলেন – "সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার

---

৬০. ঐ, পৃ. ২৭
৬১. ঐ, পৃ. ৩৬
৬২. ঐ, পৃ. ৩১

কতকগুলি ধ্বনি বাঙ্গালা ভাষায় আর মিলে না, এগুলি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু সেই সকল ধ্বনির চিহ্ন–স্বরূপ বর্ণগুলি, বর্ণ মালায় এখনও বিদ্যমান যেমন : 'ঋ, ণ, ষ'। ভাষার উচ্চারণে এই সকল বর্ণের ধ্বনি লুপ্ত হইলেও, সংস্কৃতের চর্চা কখনও লুপ্ত না হওয়ায়, বর্ণমালায় এই সকল বর্ণের স্থান চিরকাল ধরিয়া পণ্ডিতেরা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন – গতানুগতিকতা বা চিরাচরিত ধারা হিসাবে এগুলো বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে বর্জিত হয় নাই।"[৬৩]

'ণ' – এই সম্পর্কে বলেন, "মূর্ধন্য 'ণ' এর ধ্বনি এখন বাঙ্গালায় লুপ্ত। সংস্কৃত শব্দে এবং ক্বচিৎ প্রাকৃতজ ও বিদেশী শব্দে 'ণ' লিখিত হইলেও, বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ দন্ত্য 'ন' এর উচ্চারণ হইতে অভিন্ন ; যথা (কাণ, পাণ,) (= কান, পান) ইত্যাদি।

কেবল ট, ঠ,ড, ঢ–এর পূর্বে , ণ–কারের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়– ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ– তে জিহ্বা উল্‌টাইয়া মূর্ধন্য–স্থানে মূর্ধন্য 'ণ' কার ধ্বনিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালীর কানে তাহা দন্ত্য ন কারের মত শোনায়। বিশুদ্ধ মূর্ধন্য – 'ণ'–এর ধ্বনি কতকটা [ড়ঁ]–এর মত শোনায়। এই উচ্চারণ সম্ভবতঃ প্রাচীন বাঙ্গালাতেও ছিল, ইহাকে জানাইবার চেষ্টায় এই অক্ষরের বাঙ্গালা নাম – 'আণ' বা 'আণো' দাঁড়াইয়াছে"।[৬৪]

শ, ষ, স – এ ক্ষেত্রে বলেন – "এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণ এখন বাঙ্গালায় এক– ইংরেজীর sh-এর মত শিশ্ দেওয়ার ধ্বনির সহিত এগুলোর সাদৃশ্য আছে বলিয়া এগুলোকে Sibilant বা শিশ্–ধ্বনি বলা যায়। প্রাচীনকালে এগুলোর পৃথক পৃথক উচ্চারণ ছিল ; (তালব্য) 'শ' ইংরেজী Issue [= issyu] শব্দের অনুরূপভাবে উচ্চারিত হইত। ...'ষ' অন্য মূর্ধন্য বর্ণের মত জিহবাগ্রকে উল্‌টাইয়া লইয়া উচ্চারিত sh-এর ধ্বনি ছিল, এবং (দন্ত্য) 'স' ইংরেজী Sing, sang, sung, এর 's' এর মত ছিল।"[৬৫]

খণ্ড 'ৎ'

ব্যঞ্জন বর্ণমালায় বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের যে তালিকা দেন তাতে ৩৬টি বর্ণ আছে।

---

৬৩. ঐ, পৃ. ২৬
৬৪. ঐ, পৃ. ৪৬,৪৭
৬৫. ঐ, পৃ. ৪৯

অতিরিক্ত হিসেবে ২টি বর্ণের (ং, ঃ) উল্লেখ আছে, কিন্তু 'ৎ' সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি বা উল্লেখ করেন নি।

সংযুক্ত ব্যঞ্জন হ্র, হ্ন, হ্ব, হ্ল, হ্ন, হ্ম

"হ্ল, হ্ন, হ্ম (- হ+ম), হল (হ্ল)। অন্যত্র উচ্চারণ হ-কার পরবর্তী ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরে আসে ঃ হল = [ল্‌হ্‌], হ্ম = [মহ্‌]"।[৬৬]

সুকুমার সেন

স্বরধ্বনির সংখ্যা

সুকুমার সেন বলেন - "বর্ণমালা অনুসারে বাঙ্গালায় স্বরধ্বনি আটটি। [অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ ও]।"[৬৭]

অ-ধ্বনি

""অ (উচ্চারণে 'ও') + ই মিলিয়া ও-কার। করিতে › কইর্‌তে› (কইরি্‌তে)› করতে (=কোরতে), চলিতে ? চইল্‌তে› চলতে (চোল্‌তে)।"[৬৮]

স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা

স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ সম্পর্কে বলেন -" সংস্কৃতের স্বরধ্বনি অল্পবিস্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় পৌছিয়াছে। বাঙ্গালার [অ] সংস্কৃতের [অ] হইতে সম্পূর্ণ পৃথক অর্থাৎ ভিন্ন জাতির। সংস্কৃতের [অ] বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দের 'আ' ধ্বনির মতো। সংস্কৃতের [আ] দীর্ঘ ধ্বনি, বাঙ্গালার [আ] হ্রস্ব ধ্বনি, - সংস্কৃতের [অ]। তাই সংস্কৃতের সন্ধিতে অ+অ= আ। বাঙ্গালায় এমন সন্ধি অসম্ভব। বাঙ্গালায় [ই, ঈ] এবং [উ, ঊ] আছে বটে কিন্তু বানানে সেগুলির হ্রস্ব-দীর্ঘ মূল্য রক্ষিত হয় না। 'ঈষৎ' শব্দের [ঈ] বাঙ্গালায় উচ্চারিত হয় [ই], কিন্তু 'তিন' শব্দের [ই] উচ্চারণে [ঈ], তেমনি 'অকূল' উচ্চারিত হয় 'অকুল' এবং দূধ উচ্চারিত হয় 'দুধ'। সংস্কৃত [এ, ও] সর্বদাই

---

৬৬. ঐ, পৃ. ৫৯
৬৭. সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৬১
৬৮. ঐ, পৃ. ১৬৫

দীর্ঘ, কিন্তু বাঙ্গালায় প্রায়ই হ্রস্ব।”[৬৯]

ঋ, ণ, ষ

‘ঋ’ – এ সম্পর্কে বলেন – “সংস্কৃত আদি ঋ–কার অর্ধতৎসম শব্দে প্রায়ই [র] হইয়াছে। সংস্কৃত ঋণ, বাংলা রিন, সংস্কৃত ঋতু বাংলা রিতু, ইত্যাদি।”[৭০]

‘ণ’ – তাঁর মতে “বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কৃত হইতে গৃহীত। বাঙ্গালা বর্ণমালায় এমন বর্ণও কিছু কিছু আছে – যেমন [ণ, ষ], যে ধ্বনি বহুকাল পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছিল।”[৭১]

‘ণ’ সম্পর্কে তিনি দুইটি সূত্র উল্লেখ করেন। যেমন –“১)ণ–কার ধ্বনি বাঙ্গালায় উচ্চারণে লোপ পাইয়াছে।

পদমধ্যবর্তী ণ–কারযুক্ত–ট-বর্গধ্বনি প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আসিয়া অথবা প্রাকৃতে উৎপন্ন হইয়া নাসিক্যস্বরপূর্ব একক-টবর্গ ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত-কণ্টক, প্রাকৃত–কণ্টক, বাংলা– কাঁটা। ২) সংস্কৃত অ-কার পরবর্তী [ণ্ড] বাঙ্গালায় সাধারণত নাসিক্যস্বরপূর্ব [ড়] হইয়াছে। কিন্তু কখনো কখনো প্রাকৃতে সমীভূত (ণ, -ণ) হইয়া বাঙ্গালায় একক ন–কারে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত–খণ্ড, প্রাকৃত–খণ্ড, বাংলা – খাঁড় (=গুড়)।”[৭২]

শ (স, ষ) – এই সম্পর্কে চারটি সূত্র উল্লেখ করেন। যেমন – “১) পদাদিস্থিত শ – [স, ষ] সাধারণত লেখায় [স] রূপে রহিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত – শত, প্রাকৃত– সঅ, বা বাংলা – শ(শো)। ২) পদাদিস্থিত ব্যঞ্জনযুক্ত [শ] ও [স] ব্যঞ্জন ত্যাগ করিয়া লেখায় [শ] রূপে রহিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত – শ্যালক, প্রাকৃত–সালক, বাংলা – শালা। ৩) পদমধ্যস্থিত বিবিধ ব্যঞ্জনযুক্ত [শ] ও [স] প্রাকৃতে [শস–সশ] হইয়াছে। সংস্কৃত – পার্শ্ব প্রাকৃত–পস্‌স, বাংলা পাশ। ৪) পদাদিস্থিত ঋ–কার বা র–কার যুক্ত শ,স কথ্য ভাষায় অর্ধতৎসম রূপে ‘ছ’ হইয়াছে। সংস্কৃত – শ্রী, বাংলা – ছিরি।”[৭৩]

---

৬৯. ঐ, পৃ. ১৬১
৭০. ঐ, পৃ. ১৬৮
৭১. ঐ, পৃ. ১৭০
৭২. ঐ, পৃ. ১৭৬
৭৩. ঐ, পৃ. ১৮২

অতীন্দ্র মজুমদার

স্বরধ্বনির সংখ্যা

"বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সংখ্যা তেরোটি, কিন্তু সাধু ও চলতি বাংলায় অর্থাৎ কলকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় মাত্র আটটা বিভিন্ন ও বিশিষ্ট স্বরধ্বনি পাওয়া যায়। সেই আটটি স্বরধ্বনি হচ্ছে – অ, আ, ই, উ এ, এ্যা, ও, ও।"[৭৪]

অ-ধ্বনি

অ ধ্বনিকে বলেছেন বিবৃত (Open)। তাছাড়া অ–এর দু'ধরনের উচ্চারণ নির্দেশ করেন। যেমন- "(১) সাধারণ ; যেমন – কথা, রত, বলা ইত্যাদি, অনেকটা ইংরেজী law, all, caught-এর স্বরধ্বনির মত। এটাই বাংলার অ–এর নিজস্ব উচ্চারণ।

(২) ও–কার উচ্চারণ পরবর্তী অক্ষরে ই, উ, য ফলা, ক্ষ থাকলে অ–এর উচ্চারণ ও হয়ে যায়। যেমন অতি> ওতি, বসু> বোসু, অক্ষি> ওক্ষি।"[৭৫]

স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা

এ সম্পর্কে বলেন – "বাংলা উচ্চারণে কতকগুলো নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যে–সমস্ত পদ একাক্ষর বা Monosyllabic সেগুলো বাংলায় দীর্ঘ করে উচ্চারণ করা হয়। যেমন – দিন (দিবস), দীন (দরিদ্র), দিন (Give), দীন (মুসলমান ধর্ম)– এই চারটি শব্দই একাক্ষর, উচ্চারণ একই রকম।"[৭৬]

ঋ, ণ, ষ

'ঋ' – বাংলো বর্ণমালায় ঋ–বর্ণটি আছে এবং স্বরবর্ণ হিসেবেও একে ধরা হয়। বাংলায় এটাকে স্বরবর্ণ হিসেবে ধরা ঠিক নয়, কারণ 'ঋ' উচ্চারণ করা হয় 'রি' (ব্যঞ্জনবর্ণ–র+ই) হিসেবে। তিনি বলেন – "সংস্কৃতে ঋ স্বরধ্বনি ছিল, এবং সংস্কৃতের উচ্চারণে কোনক্রমেই ই–ধ্বনি বা অন্য কোন স্বরধ্বনি এর সঙ্গে যুক্ত হত না। সংস্কৃতের অনুকরণে এবং অনুসরণে আমরা ঋ–কে স্বরবর্ণ হিসাবে রেখেছি। যেমন – ঋষি, ঋণ।"[৭৭]

---

৭৪. অতীন্দ্র মজুমদার, *ভাষাতত্ত্ব*, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৭৫
৭৫. ঐ, পৃ. ১৭৯
৭৬. ঐ, পৃ. ১৭৭,১৭৮
৭৭. ঐ, পৃ. ১৮১

'ণ'– ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন এবং বর্ণমালা পরিবর্তন সম্পর্কে অতীন্দ্র মজুমদার চমৎকার একটি মন্তব্য করেন – "বাংলার হরফ এসেছে সংস্কৃত হরফের সংস্কার অনুসরণ করে, কিন্তু সংস্কৃত থেকে বাংলায় যেভাবে ধ্বনি পরিবর্তন হয়েছে, সেভাবে বাংলা বর্ণমালা পরিবর্তিত হয়নি। ষ, ণ এসব বর্ণ সংস্কৃতে যে-সব ধ্বনি বোঝাত সে সব ধ্বনি বাংলাতে নেই। কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাবেও আমাদের গোঁড়ামির জন্য এই বর্ণগুলো থেকে গেছে, আমরাও নির্বিবাদে ব্যবহার করছি। ষাঁড়, ঝরণা,– এই শব্দগুলোর ধ্বনিগত উচ্চারণ অনুসরণ করে আমি যদি লিখি 'সাঁড়, ঝরনা' তবে পরীক্ষার খাতা তো বটেই, ছাপা বইয়ের পাতাও পাঠকের দ্বারা লাঞ্ছিত হবে।"[৭৮]

তিনি আরো বলেন – "ণ– ধ্বনি বাংলায় নেই। সংস্কৃত, প্রাকৃত, এবং কোন কোন বিদেশী শব্দে ণ লেখা হলেও বাংলা উচ্চারণে এসব নেই। যেমন রণ › রন, সোণা › সোনা।"[৭৯]

'ষ'– তিনি বলেন – "শ, ষ, স – এই তিনটির উচ্চারণ বাংলাতে এখন প্রায় একই রকম – ইংরেজি sh এর মত।"[৮০] শিস্ দেওয়ার সময় যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তার সাথে মিল আছে বলে এদের শিস্ (sibilant) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং সংস্কৃতে এদের আলাদা আলাদা উচ্চারণের কথাও উল্লেখ করেছেন।

পরেশ ভট্টাচার্য

স্বরধ্বনির সংখ্যা

বাংলায় সাতটি স্বরধ্বনির কথা উল্লেখ করেন। যেমন [অ, আ, ই, উ, এ, এ্যা ও]

অ- ধ্বনি

"(১) সংস্কৃতে এর উচ্চারণ (α) হ্রস্ব 'আ'– 'আজি' শব্দে আ-কার আমরা যেভাবে উচ্চারণ করি, 'অ' এর প্রকৃত উচ্চারণ তাই। বাঙলায় এর উচ্চারণ অর্ধ বিবৃত (০),অন্যত্র বিবৃত (α) (২) বাঙলায় এর আর একটা উচ্চারণ প্রচলিত আছে। সেটা প্রায় অর্ধ সংবৃত 'ও' (০) কারের মতো। অতি (=ওতি), বসু (=বোসু),(৩) শব্দের

৭৮. ঐ, পৃ. ১৭১
৭৯. ঐ, পৃ. ১৮৬
৮০. ঐ, পৃ. ১৮৭

অন্তে এবং কখন কখন মধ্যেও 'অ' অনেক সময় অনুচ্চারিত থাকে। যথা - জল (=জল্) (৪) সংস্কৃত সন্ধিস্থলে অনেক সময় অ-কারের লোপ হয়, তাকে বলে 'লুপ্ত অ'(=ঽ)। যথা- ততঃ + অধিক = ততোঽধিক লেখায় দেখানো হলেও এটি উচ্চারিত হয় না (=ততোধিক)"।[৮১]

স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা

এ সম্পর্কে বলেন - "সংস্কৃত ও বাঙলা উচ্চারণে একটা প্রধান পার্থক্য হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বরের ব্যাপারে লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতে এক প্রস্থ হ্রস্বস্বর ও এক প্রস্থ দীর্ঘস্বর আছে .... বাঙলা উচ্চারণে এই হ্রস্ব-দীর্ঘভেদ মানা হয় না। তবে বাঙলায় একটা নিজস্ব উচ্চারণ রীতি রয়েছে, যেখানে হ্রস্ব-দীর্ঘভেদ সুস্পষ্ট, কিন্তু লেখায় সেটা ধরা পড়ে না। এই উচ্চারণ রীতির একটা সাধারণ নিয়ম যে সকল স্বরবর্ণের পরে হসন্তধ্বনি বর্তমান, সেই সব স্বরের বাঙ্লা উচ্চারণ দীর্ঘ, পক্ষান্তরে যে স্বরধ্বনির পর স্বরান্তধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেখানে পূর্ববর্তী স্বরটি হ্রস্ব উচ্চারিত হয়ে থাকে। অচ্, আজ ইত্যাদি শব্দে আদি স্বরধ্বনিগুলো দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, আর অতি, ইনি শব্দে আদি স্বরধ্বনিগুলো হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে ব্যাকরণের হ্রস্ব-দীর্ঘভেদ মানা হয়নি, হ্রস্ব স্বরও দীর্ঘ উচ্চারিত হয়েছে, আবার দীর্ঘ স্বরও হ্রস্ব উচ্চারিত হয়েছে।"[৮২]

ঋ, ণ, ষ

'ঋ'- এটাকে স্বরবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করতে চান না। তবে একে অর্ধব্যঞ্জন রূপে অভিহিত করতে চান। তাঁর মতে - 'ঋ' মূল উচ্চারণ ছিল হ্রস্ব অ-কারের অন্তর্বর্তী 'র্' (/ অরঅ /)। সংস্কৃত 'পিতৃ' শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ 'পিতর'। 'র' এর আশ্রয়ে 'ত' স্বরধ্বনি ব্যতীত ও উচ্চারিত হতে পারে বলেই ব্যঞ্জনের আশ্রয়ীভূত স্বরস্থানীয় 'ঋ'কে স্বরধ্বনি রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক বাঙলায় এর উচ্চারণ 'রি'। ঋ-কারের প্রকৃত উচ্চারণ অনেকটা অরঅ-এর মতন বলেই - পিতৃ+আলয়= পিত্রালয় (পিতর্+আলয়) হয়, নতুবা পিত্র্যালয় হতো।"[৮৩]

---

৮১. পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভাষাবিদ্যা পরিচয়,* কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৮৮
৮২. ঐ, পৃ. ২৮৮
৮৩. ঐ, পৃ. ২৮৯, ২৯০

ণ –"ণ-র ধ্বনি বাঙলায় ন-র সঙ্গে প্রায় অভিন্ন, শুধু 'র' এবং 'ট' বর্গের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় 'ণ'-র উচ্চারণ কিছুটা মূলের কাছাকাছি যায়। যথা – 'দন্ত', 'কণ্ঠ' উচ্চারণ করতে গেলে, প্রথম ক্ষেত্রে 'ন' দন্তমূল থেকে এবং পরের ক্ষেত্রে 'ণ' মূর্ধার কাছাকাছি কঠিন তালু থেকে উৎপন্ন হয়। 'ণ'-র প্রকৃত উচ্চারণ কিছুটা 'ড়' জাতীয়। পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে 'ড়' প্রায়শ 'র' বৎ উচ্চারিত হয়। ইংরেজি 't-d'-এর উচ্চারণ দন্তমূলীয়, অনেকটা বাংলা ত, দ, বা ট, ড-এর অনুরূপ, সংস্কৃত ট, ড-র মতো নয়। বিদেশি, তদ্ভব, অর্ধতৎসম ও দেশি শব্দে 'ণ'-র ব্যবহার অনুচিত।"[৮৪]

শ, ষ, স – "এদের উচ্চারণ কালে শ্বাসবায়ু প্রলম্বিত হয় অর্থাৎ কিছুটা উষ্মা বহির্ভূত হয় বলে এদের উষ্মধ্বনি বলা হয়। এদের মধ্যে শ, ষ, স-এর উচ্চারণ কালে শিস্ দেওয়ার মতো এক প্রকার শব্দ হয় বলে এদের শিস্ধ্বনি (sibliant)-ও বলা চলে। সংস্কৃতে এরা ছিল যথাক্রমে তালব্য, মূর্ধন্য ও দন্ত্য বর্ণ, কিন্তু বাঙলায় সবই শ-রূপে উচ্চারিত হয়। সবিশেষ = শোবিশেষ, কষ্ট-কশ্‌টো-'র' ও দন্ত্যবর্ণের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় এদের উচ্চারণ দন্ত্য 'স'। শ্রী = স্রী, শ্লীল = স্লীল।"[৮৫]

সংযুক্ত ব্যঞ্জন হ্ম, হ্ন, হ্ব, হ্ল, হৃ, হ্ম

"পদমধ্যস্থ 'ম' যুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে সমীভূত হয়ে বাঙলায় একক 'ম'-তে পরিণত হয়েছে। যেমন ব্রাহ্মণ › বম্‌হন › বামুন।"[৮৬]

মুহম্মদ আবদুল হাই

স্বরধ্বনির সংখ্যা

"ধ্বনি-বিজ্ঞানের পাঠ-প্রতিকল্পন (Substitution within a text) প্রথার অনুসরণ করে কতকগুলো শব্দে শুধু স্বরধ্বনি বদলে দিয়ে অর্থাৎ এক স্বরধ্বনির পরিবর্তে অন্য স্বরধ্বনি বসিয়ে বিভিন্ন অর্থ পাওয়ার দিক থেকে চলিত বাংলায় মোট আটটি মূল স্বরধ্বনির বেশী পাওয়া যায় না। যেমন, ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, ওঁ, উ।"[৮৭]

---

৮৪. ঐ, পৃ. ২৯৩
৮৫. ঐ, পৃ. ২৯৫
৮৬. ঐ, পৃ. ৩১৭
৮৭. মুহম্মদ আবদুল হাই, *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৫, ১৬

অ-ধ্বনি

"অ-অর্ধ বিবৃত (half open) স্বরধ্বনি। সংবৃত স্বরধ্বনির পূর্বে বিবৃত কি অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা যে যায় না তা না। কিন্তু উচ্চারণ সৌকর্যের জন্যই সংবৃত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী বিবৃত কি অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনিকে একধাপ উঠিয়ে নিয়ে অর্ধ-সংবৃত করে কাছাকাছি করে নেয়। তাই ধ্বনি স্রোতের কারণে অতি › ওতি, মতি › মোতি হয়।"[৮৮]

স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা

এ সম্পর্কে বলেন - "বাংলায় মূল স্বরধ্বনিগুলোর হ্রস্বতা এবং দৈর্ঘ্য দিয়ে তেমন স্বতন্ত্র শব্দ পাওয়া যায় না। বাংলার প্রতিটি স্বরধ্বনিই দুই বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের তুলনায় একাক্ষরিক শব্দে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়ে থাকে। বাংলা স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য যে নিছক উচারণগত (phonetic), মূল ধ্বনিগত (phonemic) নয়।"[৮৯] তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলায় হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর স্বীকার করলে প্রতিটি স্বরধ্বনির জন্যই একটি করে হ্রস্ব ও দীর্ঘ প্রতীক ব্যবহার করতে হয়।

ঋ, ণ, ষ

'ঋ' বাংলা লিপি ও বানান সমস্যা প্রসঙ্গে বলেন - "অতিরিক্ত ধ্বনিচিহ্নের ব্যবহার বর্ণমালাকে কিছুটা ভারাক্রান্ত করে বৈকি। সেজন্য সাধারণ লেখন পদ্ধতি পরিবেশ অনুযায়ী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনিমূলক না হয়ে নতুন শব্দসৃষ্টির দিক থেকে ক থেকে চ পৃথক ধ্বনির কিংবা ম থেকে ন পৃথক ধ্বনি এ ধরনের পার্থক্যের ভিত্তিতে Broad transcription নীতি অনুসারে মূলধ্বনিভিত্তিক হয়ে থাকে। আমাদের বাংলা লেখন পদ্ধতি কি স্বরবর্ণে কি ব্যঞ্জনবর্ণে এ ধরনের মূলধ্বনি ভিত্তিক তথা "Phonemic নীতির ভিত্তিতে তৈরি।"[৯০] তিনি 'ঋ' কে সংস্কৃত হতে বাংলায় গৃহীত অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত স্বরবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এটার অস্তিত্ব বাংলায় অস্বীকার করেন। তিনি ঋ-হরফটি 'রি' (র+ই) ধ্বনির প্রতীক বলে উল্লেখ করেন।

---

৮৮. ঐ, পৃ. ১৬০, ১৬১
৮৯. ঐ, পৃ. ২৭৪
৯০. ঐ, পৃ. ২৭৬

'ণ' সম্পর্কে বলেন – "বাংলা বর্ণমালায় দন্ত্য ন এবং মূর্ধন্য ণ নামক দুটি 'ন' রয়েছে। কিন্তু বাংলা ধ্বনিতে এক দন্তমূলীয় 'ন' ছাড়া মূলধ্বনি হিসেবে অন্য কোন 'ন' য়ের অস্তিত্ব নেই।"[৯১]

তৎসম ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দন্তমূলীয় 'ন' এর সহধ্বনি হিসেবে 'ণ' এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যেমন – কণ্টক, কণ্ঠ।

"চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে প্রশস্ত দন্তমূলীয় 'ন' – যেমন – কাঞ্চন, বাঞ্ছা, স্নান, স্নেহ শব্দের অগ্রদন্তমূলীয় 'ন'-র এবং সন্তান, পন্থা শব্দে যথার্থ দন্ত্য 'ন'-এর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন। তাই তিনি বলেন, "উক্ত সহধ্বনি নির্ণায়ক প্রতিলিপি ব্যবহৃত হোক বা না হোক বাঙালি তাদের যথার্থ উচ্চারণ করবে।"[৯২]

'ষ' বানান সংস্কার প্রসঙ্গে স, শ, ষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি শ-কে বলেছেন একমাত্র পশ্চাৎ দন্তমূলীয় অঘোষ শিস মূল ধ্বনি। সংস্কৃত বানান রীতিতে বাংলায় শ, ষ, স, হরফের উল্লেখ করেছেন। তাই কষ্ট, কাষ্ঠ শব্দে 'ষ' 'শ'-রই দন্তমূলীয় মূর্ধন্য সহধ্বনি এবং স্থান, স্তর শব্দে ত-বর্গীয় ধ্বনির আগে 'স' ও 'শ'-রই দন্ত সহধ্বনি। তাই তিনি মূলধ্বনি হিসেবে 'শ' রেখে অন্য দুটি বাদ দেওয়ার পক্ষে কথা বলেন।

উচ্চারণের জন্য তিনি বলেন – "স্থান, স্তন, ম্লান, কষ্ট প্রভৃতি শব্দ 'শ' দিয়ে শ, শ কশ্‌ট ইত্যাদি লিখলেও উচ্চারণ সৌকর্যের দিক দিয়ে তাদের পরিবেশজাত 'শ'-র সহধ্বনিমূলক থান, তন উচ্চারণ করা হবে এবং কিছুদিন যেতে না যেতে এ বানানও আমাদের চোখ-সহ হয়ে যেতে পারে।"[৯৩]

খণ্ড 'ৎ'

বাংলায় 'ৎ'-এ 'ত' এর অতিরিক্ত কোন ধ্বনি নেই বলে মত প্রকাশ করেন এবং এটাকে বাদ দেয়ার পক্ষে যুক্তি দেখান। তাঁর মতে – "খণ্ড ৎ এ – 'ত' এর অতিরিক্ত কোন ধ্বনি নেই। সেজন্য বাংলা বর্ণমালায় ৎ রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। অত্যন্ত সহজে এটিকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।"[৯৪]

---

৯১. ঐ, পৃ. ২৭৬
৯২. ঐ, পৃ. ২৭৭
৯৩. ঐ, পৃ. ২৭৯
৯৪. ঐ, পৃ. ২৭৯

সংযুক্ত ব্যঞ্জন হ্ন, হ্ন, হ্ব, হ্ল, হ্ন, হ্ম

"চলিত বাংলায় 'ন', 'ল', 'র' এবং 'ম' মূলধ্বনি কয়টির একটি করে মহাপ্রাণ রূপ আছে। তারা তাদের স্বল্পপ্রাণ রূপের সঙ্গে শব্দের অর্থগত দিক দিয়ে কোনো বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে না। সুতরাং তারা মূলধ্বনি নয়। তবু চিহ্ন, অপরাহ্ন, আহ্লাদ, হ্রদ, ব্রহ্ম প্রভৃতি স্বল্পসংখ্যক তৎসম শব্দে হ্ন, হ্ল, হ্ম মহাপ্রাণ ধ্বনি কয়টির অস্তিত্ব বিদ্যমান। ধ্বনি প্রকৃতির দিক থেকে এরা খ, ছ, ঠ, থ, ফ প্রভৃতি বর্গীয় স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মতই, কিন্তু এগুলো একটি বর্ণে চিহ্নিত না হয়ে এ ধরনের সংযুক্ত বর্ণ সহযোগে লিখিত হয় বলে সাধারণ্যে এরা সংযুক্ত ধ্বনি হিসেবে পরিচিত।"[৯৫] তিনি এদের সংস্কার করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধ্বনিরূপ অনুযায়ী খ, ছ, ঠ, থ বর্ণের মতো কোনো একটি বর্ণে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। যাতে প্রশ্ন না উঠে তার জন্য বর্তমান রূপের সাথে মিল রেখে হ্ন–, ন্‌হ, হ্ল – ল্‌হ, হ্ম – ম্‌হ রূপ করার প্রস্তাব দেন। হ্র বা হ্ব পরিবর্তন না করে শুধু 'হ্ন' কে 'হ্ন' রূপে লিখতে প্রস্তাব দেন। তাহলে চিহ্ন, চিন্‌হ, আহলাদ্, আহ্লাদ, ব্রহ্মা–, ব্রম্‌হা রূপে লিখলে সঠিক উচ্চারণ পাওয়া যাবে বলে মত প্রকাশ করেন।

রামেশ্বর শ'

স্বরধ্বনির সংখ্যা

মৌলিক স্বরধ্বনি হিসেবে [ই, এ, এ্যা, আ', আ, অ', ও, উ] এই আটটি স্বরধ্বনির উল্লেখ করেন। আবার এও বলেন, "স্বরধ্বনির ক্ষেত্রেও সংস্কৃত থেকে বাংলার কিছু স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। সংস্কৃতের স্বরধ্বনির তুলনায় বাংলায় একক স্বরধ্বনির (Monophthongs) সংখ্যা অনেক কম। সংস্কৃতে একক স্বরধ্বনি ছিল আটটি, বাংলায় একক স্বরধ্বনি সাতটি যেমন– [ই, এ, অ্যা, অ, ও, উ]।"[৯৬]

অ ধ্বনি

এক্ষেত্রে তিনি বলেন – "সংস্কৃত 'অ' ধ্বনি থেকে বাংলা 'অ' ধ্বনির উচ্চারণও

---

৯৫. ঐ, পৃ. ২৮১

৯৬. রামেশ্বর শ, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* কলকাতা, ১৩৯৯, পৃ. ৩১৪

অনেকটা পৃথক। সংস্কৃত 'অ' ধ্বনিটি ছিল প্রসারিত (Spread) এবং এর উচ্চারণ ছিল অনেকটা ইংরেজীর পশ্চাৎ প্রসারিত 'অ' এর মতো [A]। সংস্কৃত 'অ' ছিল পশ্চাৎ স্বর 'আ' [α]-এর হ্রস্ব রূপ। কিন্তু বাংলার 'অ'-ধ্বনিটি কুঞ্চিত (Rounded)। তাছাড়া সংস্কৃত 'অ' ধ্বনি নিম্ন (low) স্বর, বাংলা 'অ' ধ্বনি হল মধ্যনিম্ন (Low-mid) স্বর।"[৯৭]

স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা

এক্ষেত্রে বলেন – "সংস্কৃত উচ্চারণের দিক থেকে (Phonetically) স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্ট। .... হ্রস্বস্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হত না এবং দীর্ঘস্বর হ্রস্ব উচ্চারিত হত না। স্বনিমীয় স্তরে (Phonemically) হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, হ্রস্বস্বরের স্থানে দীর্ঘ স্বর বসালে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হত। যেমন – সংস্কৃতে কুল/kul/–বংশ, পরিবার কিন্তু কূল/ku:l/–নদীর তীর। বাংলায় লিখিত বানানে সংস্কৃতের উত্তরাধিকার অনুসারে হ্রস্ব-দীর্ঘ পার্থক্য বজায় রাখা হয় বটে ; কিন্তু বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ বানান অনুসারে হয় না। বাংলায় বানানে হ্রস্ব স্বরধ্বনি লিখিত থাকলেও সেটি দীর্ঘ উচ্চারিত হতে পারে, যেমন – কুল [ku:l]-বংশ। আবার বানানে দীর্ঘ স্বর লিখিত থাকলেও তার উচ্চারণ হ্রস্ব হতে পারে। যেমন – কূলের [Kule'r]-নদীর তীরের। সুতরাং বাংলায় কোনো স্বরই সুনির্দিষ্টভাবে হ্রস্ব বা দীর্ঘ নয়। পরিবেশ-পরিস্থিতির বিশেষ নিয়ম অনুসারে বাংলায় একই স্বরের উচ্চারণ কখনো হ্রস্ব, কখনো দীর্ঘ। বাংলায় এক অক্ষরের শব্দ (Monosyllabic word) যদি পৃথক শব্দরূপেই উচ্চারিত হয়, তা হলে তার স্বরধ্বনি দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। যেমন – মা = [মঅ], কূল = [Ku:l]। কিন্তু এক অক্ষরের শব্দ অন্য শব্দের সঙ্গে যদি যুক্ত হয়ে পূর্বপদ রূপে থাকে তাহলে তার স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয় না। যেমন কুলশীল (kulsi:l] আবার একের বেশি অক্ষরে গঠিত শব্দে শেষ অক্ষরের স্বরটি অর্ধ দীর্ঘ হয়। যেমন কূলের – [Kule'r]। বাংলা স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ স্বরের অবস্থান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; তা স্বনিমীয় পার্থক্য [Phonemic constant] সৃষ্টি করে না।"[৯৮]

---

৯৭. ঐ, পৃ. ৩১৪, ৩১৫
৯৮. ঐ, পৃ. ৩১৫

ঋ, ণ, ষ

'ঋ' বাংলা বানানে ঋ-কারের কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু এর উচ্চারণ 'রি [=র+ই] অর্থাৎ একটি ব্যঞ্জন + একটি স্বর হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন - "বাংলায় 'ঋ' এখন একটি একক ধ্বনি নয়।"[৯৯]

'ণ' সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, "অনেক সময় দেখা যায় যে, আমরা বাস্তবে একটিই ধ্বনি উচ্চারণ করি, সেটা কানে শোনায়ও একটাই ধ্বনিরূপে, কিন্তু কানে একই রকম শোনালেও আমরা একটাই ধ্বনিকে কখনো একটা বর্ণ দিয়ে, কখনো অন্য বর্ণ দিয়ে লিখি, অর্থাৎ ধ্বনি একটা কিন্তু তার জন্যে বর্ণ রয়েছে দুটো বা তারও বেশী। যেমন - বাংলায় 'পণ' আর 'মন' শব্দে যে 'ণ' ও 'ন' তা দুটো আলাদা ধ্বনি নয়, একই ধ্বনি। কারণ বাংলায় দুটোরই উচ্চারণ এক, দুটোই কানে একই রকম শোনাচ্ছে। তাই বাংলায় দু'টি এখন একই ধ্বনি। অথচ এই একই ধ্বনিকে বাংলায় কখনো 'ণ' দিয়ে লেখা হয়, কখনো 'ন' দিয়ে। এখানে একই ধ্বনির জন্যে দু'টি বর্ণ রয়েছে। এমনটি হয়েছে এই জন্য যে, বাংলা বর্ণমালায় এখনো সংস্কৃতকেই অনুসরণ করা হয়। সংস্কৃতে এই দুটি পৃথক বর্ণের সার্থকতা ছিল, কারণ এই দু'টি আলাদা ধ্বনি ছিল, এদের উচ্চারণ আলাদা ছিল, ধ্বনি দুটি কানে শোনাতো আলাদা। সংস্কৃতে মূর্ধন্য 'ণ' এর উচ্চারণ ছিল অনেকটা 'ড়ঁ' এর মতো, আর দন্ত্য-ন এর উচ্চারণ ছিল বাংলা 'ন' [ন] এরই মতো। কিন্তু বাংলায় এখন মূর্ধন্য 'ণ' এর পৃথক উচ্চারণ নেই, এর উচ্চারণ দন্ত্য-ন এরই মতো, 'পণ' শোনায় 'পন' এরই মতো। এখন বাংলা উচ্চারণে 'ণ' ও 'ন' দুটো আলাদা ধ্বনি নয়, একটাই ধ্বনি।"[১০০]

'ষ' ধ্বনিমূলের শর্তানুসারে আদর্শ চলতি বাংলায় (standard coloquial Bengali= SCB) 'ষ' 'স' কে 'শ' এর সহধ্বনি (allophone) বলেছেন। তাঁর মতে "শ, ষ, স বাংলা উচ্চারণে প্রায় একই রকম হয়ে গেছে। বানানে যাই লেখা থাক না কেন দু একটি ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালব্য 'শ'-ই/ S/উচ্চারিত হয়।"[১০১]

---

৯৯. ঐ, পৃ. ৩১৪
১০০. ঐ, পৃ. ১৯৩, ১৯৪
১০১. ঐ, পৃ. ২৯৫

বাংলায় 'ষ' 'স'-এর উচ্চারণ নেই বলে এদের 'শ'/S/এর উচ্চারণ বৈচিত্র্য হিসেবে অভিহিত করেন। 'ষ' আলাদা ধ্বনিমূল নয়।

খণ্ড 'ৎ'

'ৎ' ধ্বনিমূল হিসেবে / ত / চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে – "তথা কথিত খণ্ড ৎ-এর উচ্চারণ হল [ত্]।"[১০২]

সংযুক্ত ব্যঞ্জন হ্র, হ্ন, হ্ব, হ্ল, হ্ণ, হ্ম

সংযুক্ত ব্যঞ্জন হিসেবে উল্লেখ করেন যে, "তৎসম শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণে বাংলায় হ্র/ hr /(হ্রাস), হ্ল /hl/ (হ্লাদিনী) সংযুক্ত ব্যঞ্জন।"[১০৩]

সন্‌জীদা খাতুন

স্বরধ্বনি সংখ্যা

মূলস্বরধ্বনি হিসেবে সাতটি (৭) স্বরধ্বনিকে চিহ্নিত করেছেন। যেমন – [অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও]

অ-ধ্বনি

'ধ্বনি থেকে কবিতা' গ্রন্থে তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সাথে একমত হন। এ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন – "রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংস্কৃত রীতিমতে বাংলা 'আ'-কে অ-এর দীর্ঘরূপ হিসেবে গণ্য করে 'অ' –এবং 'আ' উচ্চারণের প্রভাব আলোচনায় এই দুই স্বরধ্বনিকে এক ধরেই তাঁর মত লিখেছিলেন। আমরা 'অ' এর চেয়ে 'আ'-এর উচ্চারণে মুখ ব্যাদানের আধিক্য লক্ষ্য করি। আর, 'ই' বা 'উ'-এর চেয়ে 'অ' উচ্চারণের জন্য মুখকোটরে পরিসর ও বিস্তারে অধিক শক্তি ব্যয় হয়, রামেন্দ্রসুন্দরের এই কথা আমরা স্বীকার করি।"[১০৪]

---

১০২. ঐ, পৃ. ২৯৬
১০৩. ঐ, পৃ. ৩২৮
১০৪. সন্‌জীদা খাতুন, *ধ্বনি থেকে কবিতা,* বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, ১৯৮৭, পৃ. ৪৪

হ্রস্বতা - দীর্ঘতা

বাংলা উচ্চারণে 'অ' 'আ' কে আলাদা স্বরধ্বনি এবং 'ই' 'উ' এর দীর্ঘতা সংস্কৃত উচ্চারণের ধারা বেয়ে বাংলায় এসেছে বলে উল্লেখ করেছেন। হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ পার্থক্যে তিনি নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের অভিমত চিহ্নিত করেন যেমন 'অ, আ, ই, উ, এ, এবং ও' কয়েকটি স্বরের উচ্চারণ সহজ, প্রসারিত এবং সঙ্কুচিত - এই তিন প্রকার।....... সংযুক্তবর্ণ এবং অনুস্বার ও বিসর্গ পরে থাকিলে তাহার পূর্ববর্তী স্বরের উচ্চারণ গুরু হয়, যেমন - ওষ্ঠ, সত্য, কিংবা, বারংবার, অধঃ, মাতঃ ইত্যাদি।"[১০৫] এক্ষেত্রে সন্‌জীদা খাতুন প্রমিত বাংলা উচ্চারণে কি কি মূল স্বরধ্বনি আছে তারই উল্লেখ করেছেন এবং সাথে সাথে দীর্ঘ-ঈ এবং দীর্ঘ-উকে উচ্চারণের তালিকা হতে বাদ দিতে চেয়েছেন ঠিকই কিন্তু বানানের তালিকা হতে বাদ দিতে চাননি।

ঋ, ণ, ষ

ঋ - কবিতার ধ্বনি হিসেব করার জন্য ঋ-কারকে র + ই হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখান অপসৃত › অপোস্‌সৃত, মসৃণ › মোস্‌সৃণ ইত্যাদি।

ণ - "মূর্ধন্য ণ-য়ের ক্ষেত্রেও বর্ণবিষয়ক আলোচনা করে আমরা কেবল হিসেব করব যে, মূর্ধন্য ট, ঠ, ড, ঢ এবং ষ-তে যুক্ত হলে মূর্ধন্য ণ-য়ের উচ্চারণ শোনা যায়। যেমন - কণ্টক, কুণ্ঠা, উষ্ণ শব্দে।"[১০৬]

ষ - বাংলায় 'শ' এর শ, স, ষ তিনটি উচ্চারণই চিহ্নিত করে বলেন - "তালব্য শ বা দন্ত্য স নামে এই দুই ধ্বনির যথার্থ উচ্চারণস্থান বোঝানো হয় না বলে ঐ নামে ধ্বনি দুটিকে ডাকা বিজ্ঞানসম্মত নয়।"[১০৭] অনেকের মতো 'ষ' কে বাদ দিতে চাননি, যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন- "....... বাস্তবক্ষেত্রে মূর্ধন্য ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় আমরা এই ধ্বনির মূর্ধা সন্নিহিত ধ্বনিরূপ ঠিকই শুনতে পাই। কষ্ট, ওষ্ঠ, উষ্ণ শব্দ গুলির উচ্চারণে মূলধ্বনি 'শ' এর উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়ে যাবার উদাহরণ সুস্পষ্ট। ... ফার্গুসনরা

---

১০৫. সন্‌জীদা খাতুন, 'বাংলা বর্ণমালা আর প্রমিত বাংলা উচ্চারণের ধ্বনিমালা', *ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩২১

১০৬. সন্‌জীদা খাতুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭

১০৭. ঐ, পৃ. ৬০

dental 'স'-এর উল্লেখ যখন করলেন তখন Retroflex 'ষ'-এর উল্লেখও করতে পারতেন, না হয় বন্ধনী চিহ্নের ভিতরে রেখেই।"[১০৮]

খণ্ড 'ৎ'

কবিতা বিশ্লেষণে ধ্বনির হিসেব করার জন্য খণ্ড 'ৎ' কে পূর্ণ ধ্বনি হিসেবে গণ্য করেন এবং বলেন - "মনে রাখতে হবে, কবিতায় খণ্ড 'ৎ' উষ্মতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে কার্যকর হবে।"[১০৯]

সংযুক্ত ব্যঞ্জন হ্র, হ্ন, হ্ব, হ্ল, হ্ন, হ্ম

যুক্ত বর্ণ উচ্চারণে ম, ল, অন্তঃস্থ ব, ধ্বনির পরিবর্তে জিহ্বা লগ্ন মহাপ্রাণ হ্ম, হ্ল, হ্ব, হ্র/হৃ উচ্চারণের কথা উল্লেখ করেন এবং দেখান - হ্ন বা হ্ণ বর্ণ দুটি 'হ-এ ন-এ বা হ-এ ণ-এ যুক্ত।

হ্ম কে বলনে, হ-এ ম-এ যুক্ত, এবং ইংরেজী প্রতিবর্ণীকরণ, ব্রাহ্ম>Brahma, ব্রাহ্মণ>Brahmin হিসেবে দেখান।

হ্র - র + র-এ হ-এ, যেমন - হ্রদ।

হৃ - র + র-এ হ-এ ই-কার যেমন - হৃদয়। এ ক্ষেত্রে র-ই কে পুরোবর্তী হিসেবে চিহ্নিত করেন।

হুমায়ুন আজাদ

নরেন বিশ্বাসের অভিধানে উচ্চারণ নির্দেশের জন্যে যেসব বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে, তার অধিকাংশের সাথেই হুমায়ুন আজাদ একমত, তবে কয়েকটি ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত নির্ধারিত বর্ণ সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ কথিত হ্রস্ব-ও, মুহম্মদ আবদুল হাই কথিত অভিশ্রুত-ও, যা নির্দেশিত হয়েছে 'ও' এবং ও-কার (ো) দিয়ে। ‹ও› বা ‹ও›-কা দিয়ে এ ধ্বনিটি শব্দের মধ্যে বা শেষে..... স্বায়ত্তশাসিত ভাবে, অর্থাৎ কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত না হয়ে যখন ধ্বনিটি বসে, তখন ধ্বনিটিকে ও' দিয়ে নির্দেশ

---

১০৮. সন্‌জীদা খাতুন, 'বাংলা বর্ণমালা আর প্রমিত বাংলা উচ্চারণের ধ্বনিমালা' *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৫

১০৯. সন্‌জীদা খাতুন, 'ধ্বনি থেকে কবিতা', পৃ. ৬৪

করলে ঠিক উচ্চারণ মনে হয় মেলে না।..... এর জন্যে উর্ধ কমা যুক্ত ও(ও') বা কিছুটা অভিনব ও–কার যুক্ত অ (অো) ব্যবহার করলে হয়তো ঠিক উচ্চারণটি মিলতো।"[১১০] ফলে নরেন বিশ্বাস যেখানে অতি, অতিথি, অতীত প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ দেখিয়েছেন–ওতি, ওতিথি, ওতিত হিসেবে, হুমায়ুন আজাদ তখন সেগুলো দেখাতে চেয়েছেন–অোতি, অোতিথি, অোতিত হিসেবে।

ঋ, ণ, ষ

'ঋ' – এ ক্ষেত্রে হুমায়ুন আজাদ বলেন "ঋকারের উচ্চারণ ঋকার (ৃ)র বদলে র-ফলা ও ইকার দিয়ে নির্দেশ করলেই ঠিক হতো : উচ্চারণটিকে মনে হতো বাঙলা।"[১১১] উদাহরণ হিসাবে দেখিয়েছেন – কৃমি › ক্রিমি, কৃষি › ক্রিশি।

'ণ'– "বাংলা বানানে সংস্কৃত রীতি মেনে যুক্তবর্ণে সমবর্গীয় নাসিক্যধ্বনি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু উচ্চারণে এর কোনো প্রভাব নেই। কারণ যুক্তবর্ণে ধ্বনি দু'টি যুক্ত থাকে না ; নাসিক্যধ্বনিটি পূর্ববর্তী অক্ষরে উচ্চারিত হয় ; এবং পরের অক্ষরে উচ্চারিত হয় যুক্ত বর্ণের দ্বিতীয় ধ্বনিটি।" যেমন – বণ্টন › [বন্‌–টোন], কণ্ঠ › [কন্‌–ঠো]। আর যদি পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে নাসিক্যধ্বনির উচ্চারণ স্থান বদলেও যায়, তাহলেও তা দন্ত্য–ন–এর সাহায্যে নির্দেশ করলেও বাক্‌–প্রত্যঙ্গের আচরণ বশতঃ তা পরবর্তী ধ্বনির চরিত্র অর্জন করবে।"[১১২]

'ষ' – নরেন বিশ্বাসের অভিধানে 'ষ' – সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেয়া আছে তার সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ বলেন – "এসব উচ্চারণ 'শ' দিয়েই নির্দেশিত হওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয় এ–অভিধানটির প্রধান ত্রুটি উচ্চারণে ঋকার, ণ ও ষ–এর ব্যবহার।"[১১৩]

খণ্ড 'ৎ'

'ৎ' সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ বলেন – "'আঘাৎ', ও 'গৎ' শব্দের ত্‌–ধ্বনির উচ্চারণের পার্থক্য তিনি বোধ করতে পারেন না।"[১১৪]

---

১১০. হুমায়ুন আজাদ, *সীমাবদ্ধতার* সূত্র, পৃ. ১০৯, ১১০
১১১. ঐ, পৃ. ১১০
১১২. ঐ, পৃ. ১১০
১১৩. ঐ, পৃ. ১১১
১১৪. ঐ, পৃ. ১১১

সংযুক্ত ব্যঞ্জন হ্র, হ্ন, হব, হ্ল, হ্ন, হ্ম

কেউ কেউ যুক্তবর্ণ উচ্চারণ নির্দেশে রোমান-বাংলা মিশ্রণকে প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু হুমায়ুন আজাদ বাংলা ও রোমীয় মিশ্রণকে মানতে রাজি নন। এ বিষয়টিকে তিনি শিশুসুলভ বলে মনে করেন।

মহাম্মদ দানীউল হক

স্বরধ্বনির সংখ্যা

"বাংলায় যেভাবেই বানান লিখিত হোক না কেন উচ্চারণের বেলায় ৩৮টি মৌলিক ধ্বনিই ভাষায় কাজ করে।"[১১৫] এক্ষেত্রে তিনি স্বরধ্বনি হিসেবে [অ, আ, ই, উ, এ, ও, এ্যা, ও] এই আটটি মৌলিক স্বরধ্বনি চিহ্নিত করেন।

স্বরধ্বনির বিভিন্নতা সম্পর্কে বলেন - "বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনির যত বিভিন্নতা আছে তার সঠিক তথ্য-উপাত্ত আজ পর্যন্ত বোধ হয় সংকলিত হয়নি। এখানে যে কটা স্বরধ্বনি দেখানো হয়েছে তা 'মান বাংলায়' বিশুদ্ধ উচ্চারণেই কেবল পাওয়া যায়।"[১১৬]

অ - ধ্বনি

ধ্বনিমূলীয় উপস্থাপনা হতে ধ্বনিক উপস্থাপনায় রূপান্তরিত করতে বাংলা ভাষায় সাধারণ সমীভবন প্রক্রিয়া থেকে একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র উল্লেখ করেন। যেমন -

ক. ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রের বিবৃতি: শব্দে /অ/ধ্বনির পরে উচ্চ স্বরধ্বনি (বা অর্ধ স্বরধ্বনি) থাকলে তার উচ্চারণ উচ্চতর স্বরধ্বনির অনুগ হবে। (অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে)।

খ. সূত্রাবদ্ধ উপস্থাপনা ঃ /অ/ —› [ও] / — [ই]

+ নিম্ন – দৃঢ় + বর্তুল		+ মধ্য + দৃঢ় + বর্তুল		+ উচ্চ + দৃঢ় + বর্তুল

১১৫. মহাম্মদ দানীউল হক, *ভাষার কথা ঃ ভাষাবিজ্ঞান*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৯
১১৬. ঐ, পৃ. ৬২

গ. সূত্রের প্রয়োগ

ধ্বনিমূলক উপস্থাপনা	সূত্র কার্যকর	ধ্বনিক উপস্থাপনা
/ অতি /	/অ/– [ও⁰] / – [ই]	[ও⁰ তি]
/ ati / n	/a/ - [o] / - [i]	[dti] n

স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা

স্বরধ্বনির হ্রস্বতা-দীর্ঘতা সম্পর্কে বলেন – "সাধারণ জ্ঞান থেকেই বলা যায় যে স্বরধ্বনি হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ হতে পারে। বাংলায় হ্রস্ব-ই এবং দীর্ঘ-ই, হ্রস্ব-উ এবং দীর্ঘ-উ ভাষা শিক্ষার প্রথম অবস্থায়ই চেনা হয়ে যায়। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন বাঙালিই বলে দিতে পারবে যে হ্রস্ব ই = ই, হ্রস্ব উ=উ, দীর্ঘ ই=ই+ই, দীর্ঘ উ=উ+উ।"[১১৮]

ঋ, ণ, ষ

'ঋ' – যেহেতু IPA তে এ ধ্বনিটির কোন চিহ্ন দেখাননি, তাই বলা যেতে পারে এটাকে তিনি বাদ দিয়েছেন।

'ণ' – এ ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়, কারণ ন/ণ – = n/ দ্বারা চিহ্নিত করেছেন।

'শ', 'ষ', 'স' – বাংলায় প্রকৃত উচ্চারণে যে ধ্বনি পাওয়া যায়, সেগুলোর IPA চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করতে ৩০টি ব্যঞ্জন ধ্বনির উল্লেখ করেন। তাই 'শ' 'ষ' = /S/ দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে – "মূর্ধন্য-ষ এর উচ্চারণ সংস্কৃতে ছিল, বাংলায় এখন নেই।"[১১৯] আবার 'স' /S/ দিয়ে চিহ্নিত করেছেন।

---

১১৭. ঐ, পৃ. ১১১, ১১২
১১৮. ঐ, পৃ. ৬৬
১১৯. ঐ, পৃ. ২৯

খণ্ড 'ৎ'

যেহেতু পূর্বে 'ৎ' বর্ণ এবং ধ্বনি হিসেবে ছিলনা তাই এটাকে ৎ = ত চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে – "ৎ আলাদা বর্ণ হিসেবে পূর্বে ছিলনা, এটি আলাদা কোনো ধ্বনিও নয়, ৎ = ত্।"[১২০]

উপসংহার

লিপি যেহেতু ধ্বনিমূলের প্রতীক বিশেষ, সবক্ষেত্রে লিপি উচ্চারিত ধ্বনির বিশুদ্ধ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, তাই পৃথিবীর এমন কোন ভাষা নেই যার বানান সবক্ষেত্রে বিশুদ্ধ উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা যায়। অনেকে বলেন, বাংলা ভাষার উচ্চারণ বানান অনুযায়ী হতে পারে না। তা না হয় মানা যায়, কিন্তু যা বানান আছে তারই একটু সুষ্ঠু নিয়ম থাকা চাই। তা না হলে উচ্চারণে সমস্যা হতে পারে। যেমন – আটানব্বই হবে না কি অষ্টানব্বই হবে, 'নিজ নিজ' হবে না কি ; 'নিজো নিজো' হবে। এমনিভাবে আরো অনেক শব্দ আছে যা নিয়ে অনেক বিতর্ক হতে পারে। বিদেশি শব্দগুলো কি বিদেশি নিয়মে হবে নাকি বাংলার নিয়মে হবে।

এখানে একটা প্রশ্ন জাগে যে, বিদেশি বা সংস্কৃত শব্দগুলো চেনার উপায় কি? বাংলা ভাষার এই যে বহুরূপতা, তার এখনও বিশ্লেষণ হয়নি। বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে বিগত শতকে বা এ শতকের গোড়ার দিকে যেসব ধারনা ছিলো, তা থেকে বাংলাদেশের মানুষ সরতে পারেনি। বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে শিক্ষিত মানুষেরও ধারনা সুস্পষ্ট নয়। আমরা জানি, "সমাজ সংগঠন মাঝে মাঝে ভাষা সংগঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।"[১২১] তাই বাংলা ভাষার উচ্চারণকে সুস্থিতি দেয়ার লক্ষ্যে একটা সর্বজন গৃহীত নিয়ম থাকা দরকার। তা না হলে উচ্চারণ নিয়ে মতভেদ বেড়েই যাবে। একই শব্দের বিভিন্ন উচ্চারণ আছে, যার ফলে দলাদলি, উচ্চারণের কুটনীতি এবং শোধনের রক্তচক্ষু বিদ্যমান। আজকে বাংলা ভাষা বটবৃক্ষের মতো চারদিকে ডালপালা প্রসারিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তাই এ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়ম থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

---

১২০. ঐ, পৃ. ২৯

১২১. রাজীব হুমায়ুন, *সমাজভাষাবিজ্ঞান* , ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১১

মোহাম্মদ আকবর ও জেবেলমুলুক শামারোখ

সুলতান আহমদ ভূঁইয়া*

[পূর্ব প্রকাশের পরবর্তী অংশ]

এত শুনি সৈন্যগণ যাই অপার।
সৈন্য সেনা দেখি ঘুড়ী করে আহাংকার।।
দেখেন্ত কুমার পড়িয়াছে মুহশ্চিত।
চারিপাশে লোক আসি ধরিল তুরিত।।
পড়িয়াছে রাজসুত সরোবর তীরে।
জল আনি দিল তবে কুমারের শিরে।।
নানান প্রকার করি চাএ সর্বজন।
কেহ না করিতে পারে কুমার চেতন।।
কেহ বোলে কহ গিয়া নৃপতি (গোচর)।
আপনার পুত্র আসি দেখউক সত্বর।।
বহু বু...... করি পুতে তুরঙ্গ আনিয়া।
অশ্বপৃষ্ঠে তুলিলেক যত্তন করিয়া।।
বাউ গাতারে ধরি সবে ঘোড়া চালাইল।
অবিলম্বে নৃর্প আগে কুমার আনিল।।
অশ্ব দেখি সর্বলোকে অচাইজ হৈয়া।
হেন দৈত্য ঘোড়া কেবা আনিল বান্দিয়া।।
ঘোড়া ধরিবারে চাএ কেহনা পারয়।
সোয়ার সহিতে ঘোড়া আপনে চলয়।।
সুলতান আগে ঘোড়া আপনে আইল।
পুত্র দেখি নরপতি বিস্মিত হইল।।

---

* প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
এ প্রবন্ধের প্রথম অংশ সাহিত্য পত্রিকার ৪০শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪০৩ সনে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট অংশ প্রকাশ করা হল। – সম্পাদক

বৈদ্য কবিরাজ আর নুমুন্দ আসিয়া।
সুত প্রতি প্রকার করে নানান মন্ত্র দিয়া।।
অষুধ মএলাএ চাইল জত মুসী গণ।
কোনরূপে না হৈল কুমার চেতন।
এই মতে রাজপুরে কোলাহল হৈল।
রোগ পরিচয্যি কয় করিতে নারিল।।
আদ্যে সাহাবানে বানি কইয়াছে সার।
তাহাকে স্মরণ পুনি হইল রাজার।।
দুত পাঠাইয়া পুনি তাহাকে আনিল।
ভক্তি করি মহারাজা কইতে লাগিল।।
নৃর্পে বোলে সাতবান শোনহ বচন।
কি কহিল কুমারের তুমি বুঝহ আপন।।
এত শুনি সাহাবান নাড়ীতে ধরিল।
কোনারা নার্পি বাহেলন্ত খান জানিল।।
নানান মতে নাড়ী ধরি চাএ সাহা আনে।
আর কোন রোগ নাই কাম (পীড়া) বিনে।।
কর জোড় করি কহে রাজ বিদ্যমানে।
কোন পীড়া না হৈল কাম পীড়া বিনে।।
কোরাকাপাল ডাকি নৃর্প কইল তুরিত।
তোমার সঙ্গেত আছে কুমার পীরিত।।
যেইরূপে পার তুমি করহ চেতন।
নতু পুত্র শোকে জান আমার মরণ।।
নৃপতির বচন শুনি পাত্রের তনয়।
কুমার নিকটে গিয়া বসিল নিশ্চয়।।
প্রেমভাবে অঙ্গের বসন খোসাইল।
বুকের বসন তান চিত্রপট পাইল।।
তাহাতে বিচিত্র দেখে পরম সুন্দরী।
যেবা চাএ ঢলি পড়ে চিত্রপট হেরি।।

চিত্রপট লৈয়া গেল নৃপতি বিদিতে।
অচাৰ্জ হৈল নৃর্প দেখিতে দেখিতে।।
ভাবিয়া সকলে বলে হইল সঙ্কট।
কুমারী আসিছে কহে কুমার নিকট।।
ফুরুক পালে কয় গিয়া কুমারের কানে।
সামারোক আসিয়াছে তোমা বিদ্যমানে।।
কন্যা আয়িসাছে হেন শুনিয়ন্তে বোল।
সামা সামা করি বীরে মেলিল নয়ন।।
পুছিলেক কোথা কহ মোর প্রাণেশ্বরী।
পাত্রে বোলেন গিয়াছে মহারাজের পুরী।।
তোমারে বৃত্তান্ত দেখি অন্ন জল (আনি)।
বহুল যাছিল তোমা না খাইলা পুনি।।
তেকারণে রসে গেল বিরস হইয়া।
মহাদেবীর স্থানে গেল লজ্জা আচরিয়া।।
অন্ন জল খায় বসি যদি চায় তানে।
নতু ক্রোধ হৈলে প্রেম ভাঙ্গিব আপনে।।
অন্ন জল আন বলি কুমারে কইল।
অতি শীঘ্রে অন্ন জল সাক্ষাতে দিল।।
নিকটে বসিয়া বীরে খায় অন্নজল।
ধীরে ধীরে কএ অতি বৃত্তান্ত সকল।।
কইল বৃত্তান্ত মতির স্থানে যতেক।
সুলতান সাক্ষাতে পাত্রে কএ একে এক।।
রাজায় এসব শুনি হৈল বিউগী।
রতিকলা স্থানে কয় হৈয়া মহাশোকী।।
অল্প অল্প আছিল পুত্র তোমার আমার।
প্রভুএ প্রথমে দিল এ দুই কুমার।।
আঁখির পুতলী পুত্র জীবের জীবন।
মদনে পীড়িত হইছে ঘটিল মরণ।।

যদিবা না ছাড়ি পুত্র যাইব পলাই।
নতুবা কামের তাপে মরিব শুকাই।।
মাতাপিতার আগে পুত্র যাইব মরিয়া।
বোল আর প্রাণ রইব কাহার লাগিয়া।।
সজল করিয়া দেয় কন্যার লাগিয়া।
বিধিএ রাখিলে পুত্র আসিবে ফিরিয়া।
চিত্ত কুমাইর গেছে বিভা করিবার।
চক্ষে না দেখিমু তারে হইতে.... ।।
প্রভু যদি দিয়া মোকে পুত্রবর শোকে।
অবশ্য আসিব পুত্র কে মারিব তাকে।।
মোহামুদ আকবরে কএ পাচালীর ছন্দ।
খণ্ডন না জাএ জান দৈবের নিবন্ধ।।

।। **খর্ব ছন্দ**।।

মনেত ভাবিয়া নৃর্প করে বিভার সাজ।
কুমার চলিয়া যাইতে বিবাহের কাজ।।
অশ্ব গজ বাহিনী সাজিল সর্বসৈন্য।
জঙ্গী পালোয়ন সাজে রনেহ অগ্রগণ্য।।
শুভ লগন করি কইল নৃর্পে বিভার সাজন।
জরির কাবাই পৈরাল বিভার ভূষণ।।
শিরেতে সুকর্ণ কোল্লাজ বাউতের নাল।
কিরিটি কবজ পৈরে ভাল ভাল সাল।।
ফিরঙ্গি পতাকা শোভে কটিতে জরিয়া।
মাণিক্যের মোফা শোভে কটিতে জরিয়া।।
মণিমুক্তা শোভে যেন বিজলি সাঞ্রে।
পাত্র বলো অতিজোত সাদনা বান্ধিয়া।
কাঞ্চনের ঘটা সব রাখিছে ছান্দিয়া।।

দেওজাত ঘোড়া আনি রত্ন সাজ করি।
কুমার নিকটে আনে বাগডোরে ধরি।।
মণিমুক্তা শোভিয়াছে ঘোড়ার লাগামে।
সুবর্ণ লাগাইয়াছে হিরা ঠামে ঠামে।।
সুরঙ্গ পলাদিয়ার দাউদি পাদ্যর।
গলএ ঘুঙ্ঘুর বাজে শুনিতে সুন্দর।।
মুক্তার রিকাব শোভে ঘোড়ার দুই পাশে।
সাজিল দেবের ঘোড়া বহু হাবিলাসে।।
নানান আভরণ করি করিল সাজন।
মাতাপিতা প্রণামিয়া করিল গমন।।
গলে ধরি জননীএ করএ কান্দন।
রাজ রানী শোকশোকী কান্দে দুই জন।।
সুলতানের পুত্রকে সপিল অ..... স্তানে।
কৃপা করি পুত্র মোর রাখিবা আপনে।।
অশ্ব আরোহিয়া বীরে চলে হেমাপুরে।
মহারথি বহু সৈন্য চলিল সত্বরে।।
এই মতে চলি যায় রাজার কুমার।
সেই দে.. লস্ত মাত্র চলে অনিবার।।
কত দিনে পাইলেক মহা এক গিরি।
বেগবন্ত কুকুর মনুষ্য খায় ধরি।।
বনমধ্যে কুকুর আছএ বলবান।
কুমারের সৈন্য মারি দিল অপমান।।
ছাড়িল বনের পন্থ পাই বহু শ্রম।
তার শেষে পাইলেক মনুষ্য আশ্রম।।
সেদেশে পুরুষ নাই রাজ্য করে স্তিরি।
কুমারের সৈন্য ধরি রাখিলেক ঘিরি।।
পাত্র বোলে কর দিয়া ছাড় এই দেশ।
নতুবা আমার সঙ্গে কর যুদ্ধ ভেস।।

কুমারে জিজ্ঞাসা করে কে চায় কর।
নতুবা রাজ্যেতে থাকহ বার বচ্ছর।।
যুবক পুরুষ সব দেয় ভাগ করি।
আপনার ঘরে নিয়া রাখিব সুন্দরী।
এই দেশে যত হয় নারী সে পদ্মিনী।
পুরুষের জর্ম নাই শোন শুদ্ধ বাণী।।
ত্রিজগতে সয়াল শুন সর্বজন।
শোনিয়া প্রিত হইল রাজা মহাজন।।
কইল দিবাকের কাইনি কাবে আনে।
শোনিয়া স্থগিত হৈল জথ সর্বজনে।
যুক্তি করে সর্বজনে কুমার সহিত।
নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করি কোন অনুচিত।।
গোপ্তরূপে চলি যাএ এমত ভাবিয়া।
ছাড়িলেন সেই দেশ রজনি হাটিয়া।।
এই মতে কত দিন হাটি গেল সবে।
জমদেশ জামনী দেশ পাইলেক তবে।।
মোহাবীর হাচন নামে জয়দেশের পতি।
বক্তারি হইল নামে মোহা নরপতি।
তিলিচমত জয়া করিছে সেই দেশ।
সুড়ঙ্গ রাখিতে পারে বান্দি এক ক্রোশ।।
জমদেশের কিছু বাজি পাইছে ভোজরাজ।
মহা অপরূপ বাজি পৃথিক্ষীর মাজ।।
বাদক আনিয়া চেতহের সঙ্গতি।
দশ মন চাউলের ভাত খাএ প্রতিনিতি।।
এক দুই য়ষ্ট মাস প্রভাত নিহারি।
দশ মন রুটি হেলে খাএ পেটভরি।।
রাজার আদেশে সেই সৈন্যের রৈক্ষতা।
তাহার সমুক্ষে নাই দলের জৈক্ষতা।

রজনীতে থাকে সেই সৈন্যের প্রহরী।
নিমেষে দশ দণ্ডের পন্থ আইসে ফিরি।।
বক্তারি দেশেত যদি গিয়া উত্তরিল।
বাজিতে মোহিত হৈয়া পন্থ হারাইল।।
হেন উপদেশ কিছু না দেখি ভাবিয়া।
ভক্ষিতে আছএ সব দিশা হারাইয়া।।
সাহাবানে গনি সয় রাজার সাক্ষাত।
জমদেশের বাজি জান এই তিলিচমাত।।
সমুদ্রের কূলে আছে পর্বত মিনার।
সপ্ততাল উঞ্চ করি নির্মিছে তাহার।।
সেই গৃহে রাখিয়াছে সপ্ত রাজার ধন।
তাহাকে ভাঙ্গিতে যদি পারে কোনজন।
তবে সে পাইব পন্থ দিসা হৈব তারে।
কুহিল বক্তারি যাইতে সেই (পর) পারে।।
এত শুনি রাজসুত চলে সেই মুখে।
বাদক চলিল সঙ্গে হইয়া মন সুকে।।
কত দিনে গেল সেই মিনার নিকট।
দেখিয়া অপূর্ব সব ভাবএ সঙ্কট।।
নবশত মনের এক পালোয়ানের সাজ।
আছারি মারিতে পারে দৈত্য গজরাজ।।
মিনার নিকটে গিয়া শক্তিরূপে চাইল।
কিঞ্চিত ঝংকার দিতে কেহ না পরিল।।
জেবের মিল্লিকে ভাবি নামাজ পড়িল।
আপনার কার্য সিদ্ধি প্রভুতে মাগিল।।
করুণা সাগরে প্রভু পতিত পাবক।
মিনার ভাঙ্গিয়া মোরে দেও সামারোক।।
এ বুলিয়া নৃপসুত ধরিয়া মিনার।
মাস্তলে ধরিয়া কীরে করিল ঝংকার।।

অঙ্গে যত বল ছিল পরিলেক টান।
তুলিয়া মিনার ভাঙ্গি কৈল খান খান।।
মিনার ভাঙ্গিয়া দেখে রজত কাঞ্চন।
পুঞ্জে পুঞ্জে রাখিয়াছে সপ্ত রাজার ধন।।
জার জেই শংকা চিত্ত নিল বীরবর।
দিসা ভক্ষ হইল ভাল চলিল সত্বর।।
বহুর নিকটে দেখে ভাল ভাল ফল।
মেদেনী উপরে লতা ধরিছে বহুল।।
লোভে চায় সর্বজনে ফল খাইবারে।
নিষেধিয়া সাহাবানে রাখিতে না পারে।।
তথাপি বাদক জাএ আর কত জন।
ফলস্তানে গেল সব খাইতে কারণ।
টাঙ্গিয়া রাখিল নিয়া শূন্যের উপরে।
এত দেখি সর্বলোকের প্রাণ কাম্পে ডরে।।
এস্তকের পন্থ সব রইল টাঙ্গনে।
অচার্য দেখিয়া সবে ভাবে মনে মনে।।
বুদ্ধি করি নাই দেখে মোক্ত হইবার।
শক্তি রূপে ভাবি চাএ না দেখি নিস্তার।।
জমদীপ অধিপতি রাজ রাজ্যেশ্বর।
তাহার অগ্রেত আসি কইল খবর।।
হেনকালে সবের ফিরাইল বরন।
শ্বেত বাস ছাড়ি পৈরে কালাই বরন।।
হেন কালে সন্ধ্যা হৈল সূর্য বৈসে পাটে।
স্তান করি বৈসে সবে নৃপতির টাটে।।
অধিক তিমির রাত্রি ঘোর অন্ধকার।
বক্তারির সৈন্য আসি ঘিরিল চারধার।।
নিশি কালে আইসে দেখে যত দলবল।
চৌদিকে ঘিরিয়া নৈল বিদ্যুৎ অনল।।

মগন উপরে থাকি করিয়া হাঙ্কার।
সৈন্যের উপরে থাকি বোলে মারা মার।।
ভয়ঙ্কর দেখি সৈন্য হৈল কম্পিত।
সাহাবানে গনি কএ রাজার বিদিত।।
দেবতা গন্ধর্ব আর মনুষ্য না হএ।
মোকাবিনের বাজি এই জানিলাম নিশ্চএ।।
ভয় না করিয়া দেখ এ তিলিচমাত।
না রহিব এই সব রজনী প্রভাত।।
ভয় পরিহরি সবে নিবারিল (নিশি)।
.... কৈল দিবাকর আসি।।
প্রভাতে আসিয়া দেখে পক্ষী ভয়ংকর।
উড়া দিয়া আইসে পক্ষী পর্বত আকার।।
দেখিলেক পক্ষী আইসে সৈন্যের নিকট।
ধরিয়া মুনষ্য গিলে পরম সঙ্কট।।
অস্ত্রসব যত মারে তাহা নাই লাগে।
ভয় পাইয়া সর্বসৈন্য ধায় চারিভাগে।।
নৃপতি ধাইয়া গেল পর্বত শিখরে।
দেখেন্ত তপস্বী বসিয়াছে এক মোড়ে।।
উর্দ্ধমুখী বসিয়াছে পরম ধেয়ানে।
গুরুপদ নেনে(?) হারিয়া মান্দেচে পরানে।।
ভকতি প্রণয় করি রাজার তনয়।
মুনীর সাক্ষাতে আসি করেন্ত বিনয়।।
ভকতি শুনিয়া মুনী মেলিলেক আঁখি।
কুমারেক জিজ্ঞাসিল কেন মন দুখী।।
তুষ্ট হৈয়া কয় তবে মুনীতে প্রধান।
পক্ষী মারিবারে মুনী কহত সন্ধান।।
মোহা মন্ত্র দিল মুনী ত্রিশূলের বাণ।
মুনীর গোচরে কয় সব বিবরণ।।

লোয়ার গঠন সেই মুনীর ত্রিশূল।
যাকে মারিবারে চায় করেন্ত নির্মুল।।
সর্বতত্ব মুনীবর কৈল ভাঙ্গিয়া।
যে সকল টাঙ্গিযাছে আনিতে খুলিয়া।।
আর যত শিখাইল বহুর বিচার।
কুরুবাদ খিবা এক বহুর মাজার।।
কুরুবের বুকে দিয়া মার সর।
.... তবে মুখে উড়িব ভ্রমর।।
উড়িয়া যাইতে পাছে পাছে ধাইয়া।
যেই স্থানে যায় আলি যাইয় চলিয়া।।
তথাতে দেখিবা এক মনুষ্য মুরুতি।
লোহার ছিকল গলে নাচে অবিরতি।।
মোর শাস্ত্র তাহাকে ছেদ্র ছয় নির্বারে।
শূল ঘাতে সেই মূর্তি হৈব সঙ্গার।।
তাহারে মারিয়া পুনি হইব মোকল।
জমদেশে রতি নিচসত ভাঙ্গিব সকল।।
ত্রিশূল পাইয়া বীরে হরসিত হৈয়া।
নাম তান জিজ্ঞাসিল চরণে ধরিয়া।।
তুষ্ট হৈয়া কয় মুনী ব্যাস মোর নাম।
বহুল ভকতি করি করিল প্রণাম।।
আশীর্বাদ দিল তানে ব্যাসত পর্বন।
তোমার মনুষ্য কাম সিদ্ধ হোক ঘটন।।
এ বলিয়া ব্যাসদেবে করিল বিদায়।
প্রণামিয়া মোহাবীর সেই রাজ্যে যায়।।
সেই স্থানে দেখে বীরে পক্ষি ভয়ঙ্কর।
কুমারে গিলিতে আসে করিয়া হুংকার।।
গাণ্ডিবে যুড়িয়া বাণ হানিল তখন।
বুক ভেদি পড়ে পক্ষি পর্বত সমান।

কুপিত হইয়া বীরে হাতে লৈল শুণ্ড।
কুরুব মারিয়া বীরে কৈল খণ্ড খণ্ড।।
.... মারিয়া বীরে সৈন্য কৈলএ কাতর।
ব্যুহ ভেদিবারে বীর গেলেন্ত গোচর।।
ব্যুহ দেখি রাজসুত হৈল চমকিত।
আকাশ সমান দেখে ব্যুহর নিরমিত।।
দৈত্য সব বসিয়াছে অতি ভয়ংকর।
ধনুতে জুড়িয়া বাণ রইছে অন্তর।।
ধুনতে জুড়িয়া বাণ রইছে ক্ষেপিয়া।
কুমার নিকটে গেল ভয় না গুনিয়া।।
ব্যুহর দোয়ারে যাই জোরেন্ত বাণ।
কুরুব মারিতে বীরে করিল সন্ধান।।
মহাশব্দ হইলেক প্রলয় আকার।
চতুর্দিকে বেড়ি সবে বলে মারমার।।
তত্ব চাহারে আছিলেক এই তিলিচমত।
তার পাছে কিছু না রইলে তফাত।।
ব্যুহর যতেক সৈন্য রইল অচর্পিত।
বাজি ভঙ্গ হই সব লাগিল গরিত।।
কুরুব লুটএ পড়ি ভূমির উপর।
তরো মুখে হাত দেখে উড়িল ভোমর।।
উড়িয়া চলিল অলি শূন্য আরু হৈয়া।
তার পাছে পাছে বীর গেলেন্ত ধাইয়া।।
গহিন কাননে গেল বনের ভিতর।
তাহাতে পাষাণের মূরতি মনুহর।।
তার মধ্যে এক মূর্তি মনুষ্য আকার।
হাতেত ছিকা লৈয়া নাচে অনিবার।।
ব্যাস মুনী দিছে এক লোহার সানাই।
সেই বাণ বীরবরে মারিলেক জাই।।

বুৰ্জ্জ..... মারিল চীৎকার।
পর্বত পরিলে জেন উঠে হাহাক্তকার।।
মূরতি ভাঙ্গিয়া বীরে দেখে অপরূপ।
ব্যুহকে ভাঙ্গিয়া পন্থ হৈল স্বরূপ।।
কুরুব মারিল যত ছিল বহু দ্বার।
নিকটে আইল সব দেখিল প্রচার।।
মোকাবিল ধারে আসি মিলিল নৃপতি।
কুমারে লেখিল পত্র মোকাবিল বিদিত।।
তোমার সঙ্গে যুদ্ধ মোর না হয় উচিত।
পন্থ ছাড়ি মিনার ভাঙ্গি কুরুব মারিচ।
তিলিচমাত ভাঙ্গি মোরে অপমান দিছ।।
তোমাকে ধরিয়া আমি করিমু সঙ্গরাম।
তবে সে জানি আমার মোকাবিল নাম।।
পদুত্তর লেখি রাজা রএ সাজ করি।
সিংহনাদ করি আইল কুহিল বক্তারি।।
দেখিয়া অপার সৈন্য বান্দে মুব দ্বারা।
বিরস বদনে আইলে করিমু সংহার।।
জমের সমান বীর গদা সনে তরু।
ভয়ংকর মূর্তি দেখি জেহেন সমরু।।
দোহে বাজিল যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
বাদক সাজিল রণে অতি মহাসোর।।
কুমারেহ দৈত্যসব পায়ে ধরি ছিড়ে।
অপমান পাইল যত বক্তারির বীরে।।
ফুরুকপালে যুদ্ধ করে ....।
উত্তকারিয়া মারে গদা গজের মাতাতে।।
বক্তারির সৈন্য মারি কৈল ছাড়খার।
মারিয়া করিল যত পর্বত আকার।
ত্রাস পাইয়া বক্তারিয়ে রণে দিল ভঙ্গ।

কেশরী দেখিয়া যেন পালাএ মাতঙ্গ।।
দ্বারেত কপট দিয়া গেল পুরী মাজ।
এথাতে বিশ্রাম কৈল চামরির রাজ।।
দিবকের ঘরে যদি গেলেন্ত চলিয়া।
তিমির করিল আসি পৃথিবী ভরিয়া।।
হরসিত হৈয়া রাজা লৈয়া সৈন্যদল।
সেই স্তানে রইলেক কমল কতুহল।।
আনন্দে জাএন্ত নিদ্রা বিভোল হইয়া।
সৈন্য সেনা প্রতি সবে ভাজন করিয়া।।
নিশি দুইভাগ কালে আসিলেক মেরা।
বক্তারির আজ্ঞাকারী রাক্ষসের ঘোড়া।।
ধনামাক্ষে না জিনিয়া বিমোক্ষ হৈয়া।
নিদ্রা জোগে বীর সবেরে জায় গ্রাসিয়া।।
এক এক করি গিলে না ভরে উদর।
এই মতে সৈন্য সব খাইল বিস্তর।।
নিদ্রা হৈতে সব বীর ধরি ধরি খায়।
দেখিয়া দেসরে মনে বড় ডর পায়।।
জাগাইয়া বীর সব জালাইল দিয়টি।
অস্ত্রধারী সর্বজনে শূল গদা ঝাটি।।
হেন শূল গদা সব লইলেক আগে।
মহা কলরব শুনি সর্ব সৈন্য জাগে।।
জেবা তার কাছে যাএ তারে ধরি খায়।
প্রহারে যথেক অস্ত্র না লাগয় গায়।।
গদা ধরি মারে বারি গদা ভাঙ্গি যায়।
বিসম সংকট রণে না দেখি উপায়।।
এক দুই করি খায় বীর মহাবল।
মধ্যে হইলেক মহা কোলাহল।।
উদ্দেশিয়া গেল ঘোড়া কুমার জথাএ।

লম্ফ দিয়া ধরিলেক কুমারের গলাএ।।
মশক ধরিয়া যেন লই যায় বিড়ালে।
তেনমতে নৃর্প লৈয়া যায় মহাবলে।।
শক্তিমান রূপে সামালি মারে বান।
তার অঙ্গে লাগি অস্ত্র ভাঙ্গিল বহুল।।
পর্বত সমান হৈল ঘোড়ার শরীর।
কুমার লইয়া দুষ্টে হইল বাহির।।
কোমারিল সাক্ষাতে নিয়া একে একে এরে।
হস্তে পদে বন্দি করি বন্দীশালায় নিয়া।
রাখিল সকল শৈন্য একত্রে করিয়া।।
জেবেল মুলুক নিয়া দিলেক বিদিত।
সুন্দর সুঠাম মোকাবিল মুহিত।। ...
কুমারের রূপ দেখি নিমগ্ন হইয়া।
মনে ধন্দ হৈল রাজা রূপ নিরক্ষিয়া।।
আইদ্য দিন নেয় বন্দীশালা ঘর।
পুরীর ভিতরে নেয় রাজার কুমার।।
রূপের বাখান তান করে সর্বজন।
তাহা শুনিয়া কন্যার মন করে উচাটন।।
কিরূপে দেখিব তারে ভাবে দিবানিশি।
ভাবের ভাবিনী যেন প্রভুর তপস্বী।।
কুমার রাখিল নিয়া পুরীর নিকট।
লোহার ছিকলে বান্দি পরম সঙ্কট।।
এই মতে রইলেক বন্দীর ভোবন।
বিসম সঙ্কট পড়ি করএ কান্দন।।
মোহামুদ আকবরে কহে শোন গুণীগণ।
প্রমাদ খণ্ডাএ জান প্রভু নিরাঞ্জন।।

।। **দীর্ঘ ছন্দ** ।।

থাকিয়া বন্দীর মাঝ কান্দএ চামরী রাজ
মুক্ত হৈতে না দেখি উপায়।
দুক্ষের উপরে দুক্ষ বিরহে অনল দুক্ষ[১]
প্রভু তুমি দেখ আঁখি ভরি।
বিরএত তনুবেরে না দেখি নিস্তার মোরে।
প্রভু বিনে না দেখি উপায়।
আমি যে রাজার সুতা না জানি দুক্ষের বেথা
লোহার ছিকলে.........।
ঘর হন্তে নিকালিলা দুষ্ট হাতে ঠেকাইলা
প্রভু তুমি দেখএ নয়ানে।
একেত বিরহের জ্বালা সামারুকে লুকালা
আর দুক্ষ না সয় পরাণে।।
আহা শামারোক প্রাণ তুমি দিলায় পরাণ
আর নি হৈব দরশন।
তোমার পীরিতি স্মরি চলিলাম হেমাপুরী
পন্থে মোর হৈল মরণ।।
কি করিমু কোথা যাইমু কার ঠাঁই জিজ্ঞাসিমু
কেবা মোরে করিব পালন।
কে মোর বান্ধব হৈব মোরে ছুরাইয়া দিব
বন্দেনেতে হইলাম শেষ।
আহা প্রভু নিরাঞ্জন হেন কৈলা কি কারণ
বিদেশেত করিলা সংহার।
এক চিত্তে প্রভুর আগে প্রভু পদের মাগে
তুমি প্রভু করহ উদ্ধার।
প্রভু সে পরম সখা সামার সঙ্গে করাও দেখা

---

১ পাঠান্তর – বিরহেতে হানে বুক

তবে মোরে বধিয় পরাণে।
সামারোক প্রাণ প্রিয়া গেলা মোরে দুক্ষ দিয়া
সেই ক্ষণে আমার মরণ।
মরিম যে নাই দাএ যদি প্রিয়ায় বক্ষে পাএ
তবে সে যাইব মনের দুক্ষ।
নয়ান মুদিয়া থাকি সেই রূপ ছায়া দেখি
আঁখি প্রকাশিতে নাই আর।
(আমার) দারুন প্রাণে ধৈর্য্য ধারিত নাই মানে
পাসরিতে না পারি দ্রসন।
কিবা দিবা কিবা নিশি তপস্বীর মতে বসি
মনে ঘোষে সামার দ্রসন।
আহা শামারোক শশী মরিমু তোমারে ঘোষি
এই কর্মে আছিল আমার।
আমা ঘোষি সামা মরে আমি মরি বন্দী ঘরে
ওই স্তানে দুইর মরণ।
মোহামুদ আকবরে কএ কেনে কর বিনয়
দৈবদশা নিবন্ধ ঘটাএ।
মোকাবিলের দুহিতা আসি হৈব তোমার দাসী
প্রভু কৃপা তোমার না ছাড়িব।।

খর্ব ছন্দ ।। রাগ গুঞ্জরি

একদিন রাজসুতা ভূবন মোহিনী।
..... শশি, রম্ভা জিনি।
আর দিন শিরিলব ভাবে মনে মন।
কিরূপে করিব আমি কুমারের দ্রসন।।
দরাইয়া নিজ চিত্ত আইল দেখিবারে।
গোপ্তরূপে চায় শিরি থাকিয়া অন্তরে।
দেখিয়া কুমারের রূপ পরে ছন্যকার।

মেঘের নিকটে যেন বিজুলী সঞ্চার।।
রাহুর নিকটে যেন পূর্ণ কলাশশী।
মন দুক্ষে বন্দী ঘরে রইয়াছে বসি।।
দেখিতে দেখিতে কন্যার (আঁখি) উলটিল।
ভাবে মগ্ন মুহর্চিত কুমারী পড়িল।।
কতক্ষণ পরে শান্ত হৈল কুমারী।
কুমার নিকটে কন্যা গেল শীঘ্র করি।।
মদনে উদাস তনু কামে থরথর।
কি বলি উত্তর দিব নাইক উত্তর।।
মন দুক্ষে পরিআচেন এ নয়ান মুদিয়া।
সামারোক চাএ বীরে ধেয়ানে ধরিয়া।।
কতক্ষণ শিরি তারে দেখিল নয়ানে।
পুনি জিজ্ঞাসিল তানে মধুর বচনে।।
কি শোকে পড়িয়াছ ভূমির উপর।
আঁখি মেলি মোর সঙ্গে করহ উত্তর।।
আঁখি মেলি দেখে কন্যা পরম সুন্দরী।
হেরিতে হানএ বান কামের শর বরি।।
পাটাম্বর শাড়ী পরি জরীর আঞ্চল।
.... খোপা করে ঝলমল।।
কাঞ্চন মাণিক্য ঝরাগাতি আছে।
সাত মাণিক্য থু পুনি মনি শোভিছে গলাতে।
বান্দিছে জাদের খোপা সুভা করে রাহিনি।
ফণি ফণা ধরিয়া যে রইছে নাগিনী।।
শিরে শোভে আলি পুনি চৌক্ষএ প্রকাশ।
কথা খানি কএ ভালা গদগদ হাইস।।
মুখে শোভে দন্ত মুক্তা প্রবল গহিনি।
প্রবত উৰ্ব্বাসী কিবা মাণিক্য ভাবিনী।।
দেব মুলিনেরে করে দেখি রঙ্গছটা।

মধুর মধুর কথা খালি লাগে মিঠা।।
.... নীরে কইলেক বাণী।
দুক্ষিয়ার নিকটে তুমি কেনে আইলা পুনি।।
কন্যায় কইল শোন আমিহ্ দুক্ষিত।
দুক্ষিএ দুক্ষির সঙ্গে রাখএ পীরিত।।
যে অবধি শুনিয়াছি তোমার বন্দীবাদ।
তোমার লাগি প্রাণী দএ ঘটিল প্রমাদ।।
তোমার দুক্ষের দুক্ষ আমি জানি পুনি।
আমার প্রাণি দিতে আসা তোমার নিছনি।।
মোকাবিলের সুতা আমি নাম স্রিরিলব।
তোমার পীরিতে আমি হইলাম উদ্ভব।।
তোমার চরণে আমি হইলাম ভজমান।
মোর প্রাণি রাখ দিয়া প্রেম দান।।
বন্ধন মোচন করি দিবাম ছাড়িয়া।
যদি নাই জাএ তুমি আমাকে ভাণ্ডিয়া।।
কুমারে বুলিল মোর তনু হইছে কালা।
ছাড়িছে বিসম শর শামারোখ বালা।।
কুমারের বিছেদ ভাবি স্রিরিলবে আসি।
বান্ধা ছিকল সব খসাইল বসি।।
সুগন্ধি গোলাপ দিয়া করাইল স্নান।
নানান মিষ্ট দ্রব্য আনি করাইল পান।
ভোজন করিয়া বীরে তুষ্ট হৈল অতি।
নিকটে বসিয়া কন্যায় মাগএ পীরিতি।।
কন্যারে মনের সাধ ভুঞ্জিতে শৃঙ্গার।
(কুমারের মনে) প্রেম ভাবএ সামার।
.... প্রেম না করে বাজাএ।
সামারু সামারু করি জপে সর্বদাএ।।
বিস্মিত হইয়া বীরে চলে যাইবারে।

ছিকলে বান্দিয়া তানে স্রিরিলবে এরে।।
দেখএ পাগলের মত না হয় স্থির।
বন্দীতে রাখিয়া কন্যা হৈল বাহির।।
লোয়ার ছিকল দিয়া কুমার বান্দিয়া।
নিজ পুরে গেল স্রিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।।
তারপরে আর দিব করিয়া মোকল।
বড় ভক্তি হৈয়া খাড়া ছামনে হইল।।
বিস্মিত হৈয়া কন্যা ফিরি ঘরে গেল।
কন্যার সহিতে বীরে বচন কইল।।
ঘরে গেলে রাজকন্যা রইতে না পারে।
পাগল করিয়া আছে চামরীর বীরে।।
আর দিন আসি কন্যা চামরীর পাস।
কাগতি করিয়া কএ মনের আবেস।।
যাহার লাগিয়া তুমি কন্দিলে যাইবা।
বন্দীতে থাকিয়া তুমি কিরূপে পাইবা।।
যাহার কারণে তুমি আসিয়াছ এথা।
আমা যদি বাম কর খাও তার মাথা।।
কাগতি শোনিয়া বীরে কইল কন্যারে।
চোর বুলিবেক মোরে কইলাম তোমারে।।।
কন্যাএ বুলিল সত্য কইলা বচন।
তিরি বধ দিব আমি তোমার সদন।।
মোর মন বাঞ্ছা তুমি না পুরাইলে আশ।
বিধিএ তোমার আশা করিব নৈরাশ।।
শব্দকার শুনি বীরে তোলি লৈল কোলে।
বদন চুম্বিয়া বীরে প্রেমরস বোলে।।
(মোকল করিয়া দাও) জাইতে তুরিতে।
ফিরিয়া আসিব এথা তোমার পীরিতে।।
পরিণয় হয় যদি শামার সইতে।

তোমা পরিণয় হৈব দেশেতে যাইতে।।
কুমারী কহিল তুমি কেমতে যাইবা।
বাহের হইতে অস্ত্র সহস্র খাইবা।।
কন্যার বচন শোনিয়া কইল কুমার।
তোমা হস্তে হৈব মোর কোন উপকার।।
স্রিরিলবে বোলে তুমি সত্য কর দড়।
বন্ধন মোচন করি আগে তুমি বর।।
এহার সন্ধান আমি দিব সর্বসাজ।
বাপুকে জিনিবা তুমি মহত্বের সাজ।।
শোনিয়া কন্যার কথা করিল শপথ।
তোমা পরিণয় করি লইমু হেমাপথ।।
শ্রিরিলবে বোলে তুমি সত্য কর দর।
সামারুকের মাথা খাও যদি সত্য লর।।
কুমারে যে সত্য কৈল এই কথা সার।
তুমি যে কইলা কথা না লরিব আর।।
শ্রিরিলবের মাথে হস্ত দিলেক কুমার।
এই মতে ধর্মসাক্ষী কৈল তিনবার।।
কইল জে জনে খর্গ দিবাম আনিয়া।
আমাকে মারিব বাপু এহার লাগিয়া।।
অধরে অধর রাখি কইল কুমার।
তোমার প্রসাদে দুক্ষ খণ্ডিল আমার।।
তাহা শুনি রাজসুত হরসিত হৈয়া।
প্রণাম করিল শ্রিরি চরণে পড়িয়া।
কুমারী কইল আমি যাই নিজ ঘরে।
জালখর্গ লইয়া পুনি আসিব সত্বরে।।
পুরী মধ্যে গিয়া কন্যা........।
কুমার কাটিব নৃর্পে কালিকা বেহান।
সত্য করিয়াছে জান পাপিষ্ঠ রাজন।।

প্রভাতে কুমার কাটি কালিকা পূজন।
এমত শোনিয়া কন্যা হৈল চমকিত।
শর খাইআ মৃগ জেন পড়িল ভূমিত।।
দিবেসর দিবেসর বুলি কুমারীর মন।
রাত্রি হএ রাত্রি হএ মাগে প্রভু স্তান।।
সন্ধ্যাকাল হৈতে শ্রিরি সেই স্তানে গেল।
জালখর্গ অস্ত্র তান সঙ্গতি লইল।।
কুমার নিকটে আসি খেলিল বন্ধন।
নানান মিষ্ট দ্রব্য আনি করাইল ভোজন।।
অন্ন জল খাইল যদি বুলিল বচন।
কালিকা বেআনে সত্য তোমার নিধন।।
কইয়াছে মহারাজে পুজিবেক কালী।
তোমারে কাটিয়া দিব কালিকার বলী।।
এ বুলিয়া জালখর্গ দিল য়স্ত্র ধার।
বুলিলেক এথা হন্তে শীঘ্র হও পার।।
সান্তাইয়া কএ শ্রিরি শোন সমাচার।
এই জালখর্গ কথা কইব তোমার।।
এই খর্গ মার যারে না বাঁচিব আর।
জমের আলয়ে যাইব হৈয়া সংহার।।
সোআ হাত দীর্ঘ হএ এই অস্ত্রজাল।
কইছে দাউদ নবী এই বর কাল।।
যাকে আজ্ঞা কর তুমি তাহাকে মারিব।
দেও দৈত্য দানব যক্ষ কেনা বাচিব।।
..... জাতান আর খর্গের বিদার।
এই অস্ত্র মারে যারে হৈব সংহার।।
আর এক কথা কই শোন মহাজন।
মোর বাপু তোমা সঙ্গে হইবেক রণ।।
জাল দিয়া বন্দী কর না মারিও প্রাণে।

পুনিপুনি দিব্য দিয়া কৈল তান স্তানে।।
এ বুলিয়া শ্রিরিলবে প্রণাম করিয়া।।
বিদাএ হইল শ্রিরি বহু আশ্চাসিয়া।।
জালখর্গ পাইয়া বীরে হরষিত মন।
বাহির হইয়া বীরে ভাবে মনে মন।
ক্রোদ্ধ মুক্ষে তান সঙ্গে যে করে খরতর।
হানএ বিসম ঘাএ তাহার উপর।
এই মতে বহু সৈন্য করিয়া বিদার।
রাক্ষস যথেক জন হইল সংহার।।
মারিয়া বহুল সৈন্য গেল বন্দীঘরে।
আপনা যথেক সৈন্য নিকালে বাহিরে।।
বন্ধন মোচন করি করিলা মোকল।
নিজ সৈন্য লৈয়া বীরে চলে কুতুহল।।
নানাস্থানে সৈন্য সব গেল পলাইয়া।
একত্রে করিল সৈন্য তবল মারিয়া।।
সৈন্যের মাজারে বীরে করে সিংহনাদ।
জানিল সকল সৈন্যের ঘটিল প্রমাদ।।
পহরকের পন্থ যদি গেলেন কুমার।
মোকাবিল স্থানে সবে কএ সমাচার।।
তোমার যথেক সৈন্য মারিয়া চামরী।।
... চলি জাএ সিংহনাদ করি।।
বন্দী হতে নিজ বলে গিয়াছে কুমার।।
নিজ সৈন্য ডাকি নৃর্প বোলে মারমার।।
শোনিয়া নৃপতির সৈন্য চৌদিগে ঘিরিল।
দেখিয়া চামরীর সৈন্য খর্গ হাতে লৈল।
সোয়া হাত জাল পুনি দিলেক ছাড়িয়া।।
ছয় দণ্ডের পন্থ যুরি রইল ছাপিয়া।।
যত সৈন্য আছিল সকল সংহারিল।

এক জন ফিরি যাইতে কেহ্ না পারিল।।
তাহা দেখি মোকাবিল ক্রোদ্ধ হৈল অতি।
আজ্ঞা দিল জালখর্গ আন শীঘ্র গতি।।
সর্বদিন জালখর্গ থাকে জেই স্তান।
... ভাণ্ডারী সেই জাল নির্গমন।।
কইলেক জালখর্গ আনি দেয় এবে।
ভাণ্ডারী কইল খর্গ নিছে শ্রিরিলবে।।
কইলেক সেই জাল শ্রীরিলবে নিছে।
সেই জালখর্গ নিয়া চামরীকে দিছে।।
ভাণ্ডারীর মুক্ষে শুনি অপরূপ কথা।
ক্রোধ হৈয়া মোকাবিলে কাটে তার মাথা।।
শ্রীরিলব আনাইয়া বিস্তর গঞ্জিল।
সোনার ছিকল দিয়া বান্ধিয়া রাখিল।।
হাতেত ধরিয়া তারে করিল বন্ধন।
ক্রোধ করি মহ্‌রাজে কইল বচন।।
বুলিল চামরী আগে আনিমু বান্দিয়া।
অনলে পুড়িমু দোহে একাত্র করিয়া।।
মহাক্রোধে গেল রাজা যুদ্ধ করিবার।
ঠেকিল বিসম যুদ্ধ দেহেন মাজার।।
মারি ... সৈন্য লণ্ড ভণ্ড কইল।
অবশেষে ... ... করিল।।
বান্দিয়া রাখিল তারে দিয়া অপমান
সে রাজ্যের সৈন্য লৈল চামরীর সরণ।।
রাজ সিংহাসনে উঠিলেক কুমার।
হইল নতুন রাজা রাজ্য অধিকার।।
বন্ধনে থাকিয়া স্ত্রীরি পাঠাইল দাসী।
কুমার নিকটে বার্তা কইলেক আসি।।
শোন কই নরপতি অপূর্ব কথন।

তোমা হেতু স্রীরিলব হৈছে মরণ।।
হাত পায় যে বিরহে তোমার।
সমনের দেরী নাই সোআশ মাত্র সার।।
(শ্রীহিন্য এআছিন)।।
জালখর্গ তোমারে যে দিয়াছে কারণ।
তেকারণে মহারাজে করিছে বন্ধন।।
এথেক শোনিয়া বীরে পুরী মধ্যে গেল।
বন্দী হন্তে শ্রিরিলবে মোকল করিল।।
মান্যতা করিয়া বীরে তুলি লৈল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল শিরকণ্ডি কপোলে।।
যেই ঘরে শ্রিরিলব করিছে বন্ধন।
সেই ঘরে মোকাবিল আনিল তখন।।
হাতে পায়ে দড়ি দিয়া করিল অপমান।
বুকেত বান্ধিয়া তবে দিলেক পাসান।।
তিতিয়া রাত্রি দিবস নৃর্প বন্দীতে রইল।
শ্রিরিলিব আনাইয়া মোকাবিলে কইল।।
সুতা সম্মোধিয়া নৃর্পে কইল বিস্তর।
জাইবারে আজ্ঞা দিল চামরী গোচর।।
আমারে ছোড়াও বাচ্চা আপনে জাইয়া।
চামরি কুমার স্তানে তোমা দিমু বিয়া।।
.... কএ আসি রাজ সুতা।
আমাকে পীরিতি ভাবে কইয়াছে পিতা।।
কান্দি কান্দি কএ কন্যা শুন প্রাণেশ্বর।
বোল চাই কোন রূপে পাইমু খবর।।

... ...

হাসিয়া কুমারে বলে আমি আজ্ঞা পারি।
যেই আজ্ঞা কর তুমি সেই কর্ম করি।
সিংহাসন ছাড়ি দেও বাপু করৌক রাজ।

শ্রীরিলবে বলে শুন এহি কর কাজ।।
শ্রীরিলবের আজ্ঞা শুনি রাজাকে আনিয়া।
সৈন্য সেনা সিংহাসন দিলেক ছাড়িয়া।।
সিংহাসনে বসি নৃর্পে কহিল তখন।
চামরি কুমার কর বিবাহের সাজন।।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে নৃত্য ধ্বনি।
কুমার কুমারী দোহে একস্থান করি।
দিবানিশি আনন্দে রহিল দুইজন।
কৃতি কর্ম নাহি কেনে ভাবে মনে মন।।
কুমারে সাক্ষাতে আসি বলে সখীজন।
রাত্রে বাস নাহি কেনে নহে কি কারণ।।
সখীস্থানে বীরবরে কহে যে হাসিয়া।
সত্য হতে শামারোখে রাখিছে বান্দিয়া।।
হাসিয়া কহিলে মধুর বচন।
শামারোখে দেখাইলে ভুঞ্জি কামরতি।
শামারোখ সইতে সত্য করিয়াছি সবে।
সেই বিনে অন্য নারী বিফল আমার।
এই মতে কত দিন সেইস্থানে ছিল।
প্রাণ (প্রিয়া) স্থানে বীরে বিদাএ হইল।।
হেমাপুরে ... দেয়ত মেলানি।

... ...

খাইতে সম্বল মাত্র নৌকাতে ...।
... যাইয়া বীরে নৌকাতে উঠিল।।
চলিল শ্বশুর প্রণামি বীরে সবা সম্বোদিল।।
সিরি সাস্তাইতে বীরে মন্দিরে চলিল।

... ...

কোলেত লইয়া কন্যা বোলে জেব রাএ।
অল্প কত দিন দুরে করহ বিদায়এ।।

কান্দিয়া কান্দিয়া কহে মুই অভাগিনী।
তোমার কারণে হইলুম কূলের কলংকিনী।।
কিরূপে রাখিমু প্রাণ পাঠিষ্ঠ জীবন।
মুনিতে মুনিতে মোর হইল মরণ।।
গলাতে ধরিয়া কএ শুন প্রাণপ্রিয়া।
আমি তোমার সঙ্গতি জাইমু চলিয়া।।
ধরিয়া কুমারে গালে কোলেত বসিয়া।
থাকি থাকি ঝুকি ঝুকি উঠএ কান্দিয়া।।
কুমারের মুখ শ্রীচন্দ্র মুন মুন।
কি হৈল কি হৈল বলি করএ কান্দন।।
নয়নের জলে কন্যার তিতিল বদন।
সান্তাইতে কুমারে না পারে কদাচন।।
কান্দিয়া কএল কন্যা গদগদ বাণী।
দুক্ষিনীরে সঙ্গে নেয় শুন গুণমনি।।
কুমারে কইল শুন কাপুরুষ কাজ।
শুনিয়া সকল লোকে আমা দিব লাজ।।
হেন কর্ম কে করিবে নিরূজ্জ গোত ভরি।
সমন সংকটে সঙ্গে নিছে নিজ নারী।।
অল্প কতদিন রহ চিত্ত খেমা দিয়া।
প্রাণরক্ষা পাইলে পুনি আসিব ফিরিয়া।।
কান্দি কান্দি কএ কন্যা শোন প্রাণেশ্বর।
বোল চাই কোন রূপে পাইমু খবর।।
এ বোলিয়া রাজসুতা কান্দে আরবার।
সইতে না পারে ... মার।
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি বদনে বদন।
... করি দুই জনের কান্দন।।
নানান প্রকারে বীরে কন্যা সান্তাইল।।
মোহাম্মুদ আকবার কএ স্রিরি শান্ত করে।

বিরহ অনলে সামা রৈচে হেমাপুরে।।
স্ত্রীলোক সান্তাইয়া হেমাপুরে যায়।
তপস্বী সামার লাগি উঠিল নৌকায়।।

।। জমক ছন্দ।।

স্ত্রী সান্তাইয়া বীরে হেমাপুরে যায়।
সৈন্য সেনা সঙ্গে করি হইল বিদায়।।
সমুদ্র গহিন নৌকা বাহে বহু বেগে।
বতিসব দোমি নৌকা চলে বহু আগে।।
এই মতে কত দিন গঞ্জিল নৌকায়।
পন্থ হারাইয়া সবে নোনা পানি পায়।।
সেইস্থানে নাই ভাটা নাহিক উজান।
উলুটা (২) মুকতি বহু দিল অপমান।।
মনুষ্যের হও মতো দেখিএ সম্পাস।
জল হতে উঠি নিত্য করএ উসকাস।।
সেকান্দরে বানাইছে কলের এক হাত।
দেখিলে জানিব সবে এই জেনে মতে।।
চতুর্দিগে চাএ নৌকা দেখিএ আকুল।
জেন মতে পরী সবে হইল বিভোল।।

... ...

মোহা এক গিরি দেখে অধিক সঙ্কট।।
... রইল বীরে হইয়া কাতর।
হেনকালে আইল দেখে সর্প অজগর।।
পাহাড় পর্বত গিরি পরে তার ভারে।
তাহা দেখি কুমার ছাপিতে চাহে ডরে।।
অতি বড় সর্প দেখি মনে ভয় পাইয়া।
কুমার ভাঙ্গে নামাজে রইল লুকাইয়া।।
সমুদ্রে লামাইয়া তায় জল খাএ সর্পে।

নিকটে রইতে নারে হুর্জ্জঙ্গের(?) তাপে।।
মেঘে যেন টানে জল সেই মত শোষে।
হেনকালে আইল জেন হুর্জ্জঙ্গের বাসে।।
হেনকালে শূন্যে আসি ভোমরে গুঞ্জরে।
আচম্বিতে পড়িলেক হুর্জ্জঙ্গের শিরে।।
ভোমরার দন্ত সবে করে কড়মড়।
.... খাইয়া বৌরাজ রইল নির্জিয়া।
খাই চিন্য জেত জল এরে উগালিয়া।।
বড় সোস্তে তার মাঙ্গস খসি পরে।
হেনকালে মৃগখণ্ড আকালে ধরিয়া।।
... দেখিয়া বীরে প্রভু প্রণামিল।

....

[পুথি খণ্ডিত]